দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ১৭ মার্চ - ২০১৪।। ২ চৈত্র - ১৪২০।। website : www.eswastika.com

টিম মোদী

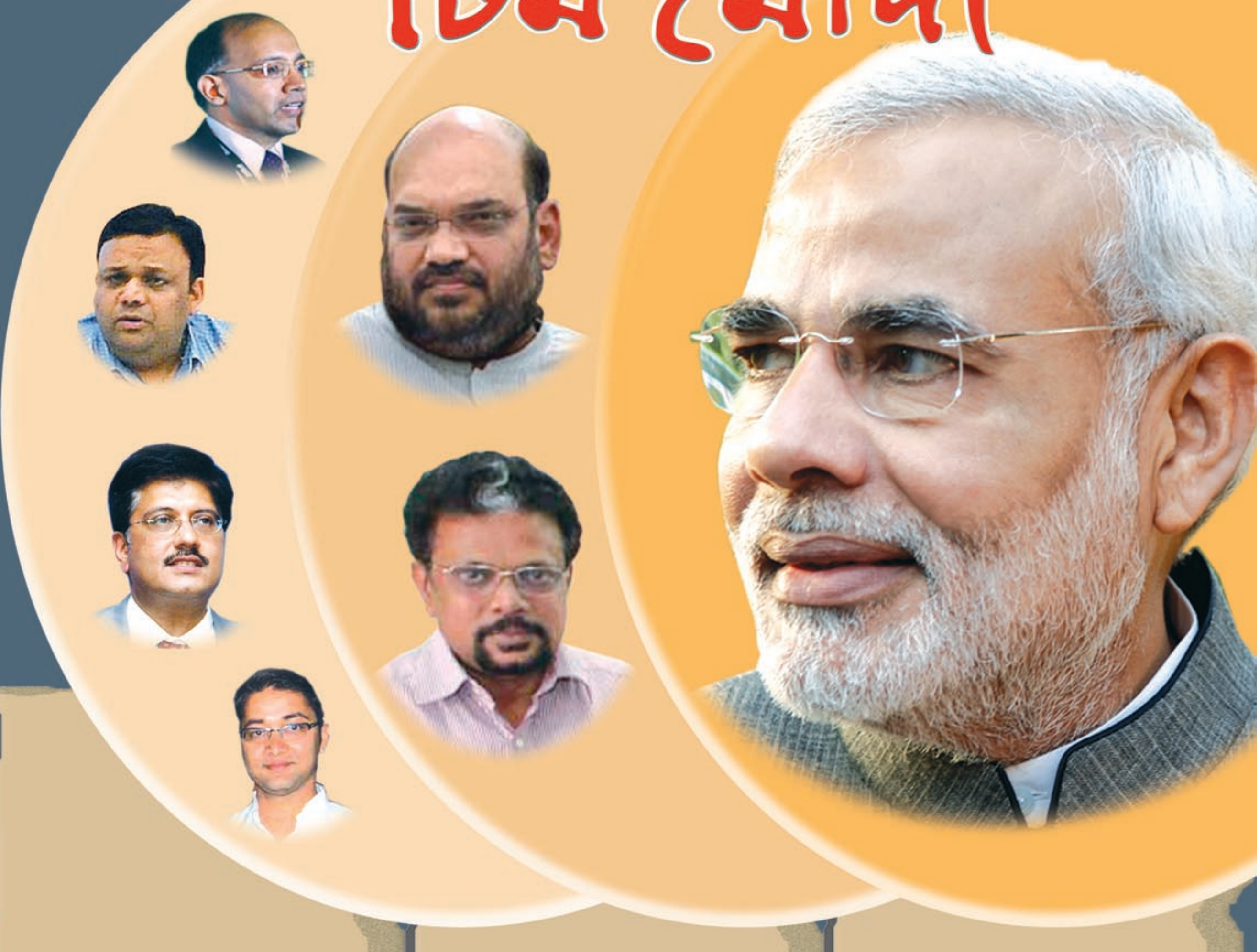

মমতার হাত ধরে আন্না কি চাণক্য হয়ে উঠতে চাইছেন?
— সাধন কুমার পাল
পৃঃ - ১২

ভারত উত্তরণের এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ও তাঁর নেপথ্য বাহিনী
— সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃঃ - ১৪

কেন মোদী এত জনপ্রিয়?
— তভলীন সিং
পৃঃ - ২৭

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

এন ডি এ জোট কমপক্ষে ২৮০টি আসন পাবে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৯

খোলা চিঠি : প্রেমে, রণে, ভোটে নীতিকে বুড়ো আঙুল, জয় অগণতন্ত্রের জয় ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

মমতার হাত ধরে আন্না কি চাণক্য হয়ে উঠতে চাইছেন? ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১২

ভারত উত্তরণের এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ও তাঁর নেপথ্য বাহিনী ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৪

আমি কেন তখতে মোদীকে চাই? ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ১৯

ভোজকর্তা ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২১

ভারতীয় সংস্কৃতির মহান সাক্ষী মথুরা-বৃন্দাবন ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২২

কেন মোদী এত জনপ্রিয়? ▯ তভলীন সিং ▯ ২৭

পরিবর্তনের কীর্তন ▯ শ্রীচৈতন্য বর্ধন ▯ ২৯

কেরলে হিন্দু ভাবাবেগে আঘাতের প্রতিবাদে সোচ্চার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ▯ ৩০

কেরলে রক্তাল্পতায় ভুগছে সিপিএম ▯ ৩১

ধর্ম কোনো ডগমা বা মত নয়, বিচারবুদ্ধিযুক্ত মূল্যবোধ ▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ৩২

পদ্মফুলে ভোট ▯ স্বস্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৭

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ ১৪-১৮

নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ ▯ চিঠিপত্র : ৩৬ ▯ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৮ ▯ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ ▯ ▯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ২ চৈত্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৫, ১৭ মার্চ - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

হিন্দুদের বিরুদ্ধে স্বঘোষিত উদারপন্থীদের ষড়যন্ত্র

বাক্-স্বাধীনতার নামে উদারপন্থী, বুদ্ধিজীবী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে স্বঘোষিত কিছু লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিরন্তর মিথ্যার বেসাতি করে চলেছে। হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগ, ঐতিহ্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বকে আঘাত করে চলেছে। সম্প্রতি এই সূত্রে মার্কিন লেখিকা ওয়েনডি ডোনিজার-এর নাম উঠে এসেছে। এই নিয়েই এবারের বিষয় — হিন্দুদের বিরুদ্ধে স্বঘোষিত উদারপন্থীদের ষড়যন্ত্র।

দাম একই থাকছে— ১০ টাকা মাত্র। সত্বর কপি বুক করুন।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ণ

আমাদের দেশের জনগণ যাঁহাদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে লোকসভা রাজ্যসভা বিধানসভা ইত্যাদিতে নির্বাচিত করিতেছে এবং তাঁহারা আবার রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি প্রমুখ যাঁহাদের নির্বাচিত করিতেছেন, তাঁহাদের হাত দিয়াই তৈরি হইতেছে দুর্নীতি-সহ অপরাধ প্রতিরোধের নানা আইন। অথচ এই জনপ্রতিনিধিদেরই বিরুদ্ধে বহু অপরাধ রহিয়াছে। শুধু সাধারণ অপরাধ নয়, দুর্নীতির অভিযোগ তো রহিয়াছেই, আছে খুন ধর্ষণ চুরি ডাকাতির অভিযোগও। সংসদের দুই কক্ষ এবং বিধানসভাগুলির সদস্য হিসাবে দেশে যে ৪৮৩৫ জন আইন প্রণেতা রহিয়াছেন তাঁহাদের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১৪৪৮ জনের বিরুদ্ধে অপরাধে যুক্ত থাকিবার অভিযোগে মামলা চলিতেছে। ইহা ব্যতীত বহু সদস্য অপরাধ করিলেও জনগণ ভয়ে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইতে সাহস করেন না। সাক্ষী না পাওয়ায় বহু মামলা খারিজ হইয়া যায়। আবার বহুদিন ধরিয়া মামলা চলিবার ফলে শাস্তির কোনো মূল্যই থাকে না। সম্প্রতি দেশের শীর্ষ আদালত চার্জ গঠনের এক বছরের মধ্যে দুর্নীতি এবং গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধিদের মামলা নিম্ন আদালতে শেষ করিতে হইবে বলিয়া রায় দিয়াছেন। অভিযুক্ত সাংসদ ও বিধায়কদের ক্ষেত্রে প্রত্যহ শুনানি করিয়া মামলা ত্বরান্বিত করিবার নির্দেশও দিয়াছেন শীর্ষ আদালত। দেশে দুর্নীতির পুরোধা কংগ্রেস। সুপ্রিমকোর্ট পূর্বেই এই বিষয়ে কঠোর অবস্থান লইলেও দোষী সাব্যস্ত সাংসদ ও বিধায়কদের বাঁচাইতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকিয়া অর্ডিন্যান্স পাশ করানো হইয়াছিল। অর্ডিন্যান্সে বলা হইয়াছিল আদালত অপরাধী ঘোষণা করিলেও আইনসভার সদস্যদের সদস্যপদ বাতিল হইবে না। তাঁহারা আইনসভার অধিবেশনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ চোরেরা নিজেরাই অপরের চুরির অপরাধের শাস্তি লইয়া আলোচনা করিবেন।

অতীত অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস বলিতেছে, এই দেশে দুর্নীতির জন্মদাতা কংগ্রেস। স্বাধীনতার পর শাসন ক্ষমতায় বসিয়া কংগ্রেস নামক দলটি দুর্নীতির পঙ্কিলতায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। রাজীব গান্ধী, নরসিমা রাও এবং মনমোহন সিং জামানায় দুর্নীতি বিপুলভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী সরকারের দুর্নীতিও বাড়িয়া চলে। দুর্নীতির একটি বিশেষ রূপ দেখা দেয় প্রায় ৩৫ বছর আগে। আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইবার পরে ক্ষমতায় থাকিবার সুবাদে আইনের পরিবর্তন ঘটাইয়া অব্যাহতি পাওয়া। এই ধরনের দুর্নীতি পরবর্তীকালেও দেখা গিয়াছে। রাজনীতিকে অপরাধমুক্ত করিবার উদ্যোগ সুপ্রিম কোর্ট লইলেও বহুদিন পূর্ব হইতেই নরেন্দ্র মোদী দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছেন। এখন সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে অপরাধ কতটা দূর হইবে কিংবা রাজনৈতিক দলগুলির উদ্যোগে নতুন রূপে অপরাধ ফিরিয়া আসিবে কিনা তাহা ভবিষ্যতের বিষয়। তবে এই উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদ যোগ্য। বাহুবলী প্রার্থীরা এখন কোন রূপে আবির্ভূত হইবেন?

মনে রাখিতে হইবে, আমাদের সংবিধান অনুসারে সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের ব্যাখ্যামাত্র করিতে পারে—আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। সংসদ বিধান সভা কর্তৃক প্রণীত আইন সংবিধানের মূল সুরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালত মতামত দিতে পারে। তাই আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে তাহার সীমার মধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হয়। এই সীমাবদ্ধতার জন্য আজ বহু রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তিগণ আইনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন। আজ এই বিষয়ে পুনরায় চিন্তা এবং বিচারের সময় আসিয়াছে

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রী-গুরু' গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব-সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব-প্রচার। সেই জন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সংবাদ প্রতিবেদন

সঙ্ঘ তার কাজের মর্যাদা অতিক্রম করবে না : ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আমারা রাজনীতিতে নেই। আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্যই কাজ করব। আমাদের নিজেদের কাজের মর্যাদা আছে। আমরা সেই মর্যাদার রেখা অতিক্রম করব না। এই সময় কে আসবে (সরকার গড়বে) সেটা বিষয় নয়, বড় কথা হলো কার আসা দরকার (পরবর্তী সরকার গড়ার)। ব্যাঙ্গালোরে প্রতিনিধিসভার বৈঠকে সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে এই কথাগুলি বলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করেন— 'সর্বেন্দ্রিয় গুণ ভাসম্, সর্বেন্দ্রিয় বির্বর্জিতম্'— সকল চেতনারই মূল উৎস পরমাত্মা, তবুও তিনি চেতনার উর্ধ্বে, তিনি নিরাসক্ত।

গত ৭, ৮ ও ৯ মার্চ ব্যাঙ্গালোরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক হয়ে গেল। সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত প্রদীপ জ্বালিয়ে এই বৈঠকের উদ্বোধন করেন। এর আগে ব্যাঙ্গালোরে আরও তিনবার প্রতিনিধিসভার অধিবেশন হয়েছে। কর্ণাটকের পুত্তুর ও ম্যাঙ্গালোরেও একবার করে এই অধিবেশন হয়েছে। সারা দেশ থেকে এবারে এই অধিবেশনে ১৩৮৫ জন প্রতিনিধিসহ সঙ্ঘের কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধিসভা গত এক বছরের সঙ্ঘের কাজের বিস্তার, বিভিন্ন কাজকর্ম, জাতীয় জীবনে তার প্রভাব এবং বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে আগামী এক বছরে সঙ্ঘের কাজের গতিমুখ স্থির করে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও সংশ্লিষ্ট কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করে। সেবা, সামাজিক ঐক্য ও অন্যান্য সঙ্ঘকার্য যা সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে করতে হবে, তা নিয়েও আলোচনা হয়।

সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী তাঁর প্রদত্ত ২০১৩-১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে জানান, এবছর সারা দেশে মোট ৬৮টি সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ (প্রশিক্ষণ শিবির) হয়েছে। প্রথমবর্ষ বর্গ হয়েছে ৫৪ স্থানে। প্রথমবর্ষে ৭০৪৫ স্থান থেকে ১০৮২১ জন স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষ বর্গ হয়েছিল ১২টি স্থানে। এইসব বর্গে ২২৩১ জন স্বয়ংসেবক ১৮২৫টি স্থান থেকে অংশগ্রহণ করেছিল। তৃতীয় বর্ষের বর্গে ৬০৭ জন স্বয়ংসেবক ৫৬৫ স্থান থেকে এবং তৃতীয় বর্ষ বিশেষ বর্গে ৩৬০ জন স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সারা দেশে এখন ৪৪৯৮২টি শাখা ২৯৬২৪ স্থানে চলছে। সারা দেশে সাপ্তাহিক মিলন ১০১৪৬ এবং সঙ্ঘমণ্ডলী ৭৩৮৭ স্থানে চলছে। গত তিন বছরের নিরন্তর চেষ্টার ফলে শাখার সংখ্যা ২০০০ থেকে ২৫০০ হয়েছে।

এই বছরে বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারীর সঙ্গে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা স্বামীজীর সার্ধজন্মশতবর্ষ পালন করেন। দক্ষিণবঙ্গে গত ১১-১২-১৩ জানুয়ারি '১৩ কল্যাণীর গয়েশপুরে 'বিবেকানন্দ যুব শিবির'-এ ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী ১০ হাজার স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেন। নাগপুরে ১৫ হাজার মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা সমাজসেবা ও গ্রামোন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করবে বলে শপথ নেন। দিল্লীতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের এক সম্মেলনে ১৫০ জন উপাচার্য অংশগ্রহণ করেন।

নতুন দেশপ্রেমী সরকার গঠনে স্বয়ংসেবদের আহ্বান জানাল আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভরা দেশের সংকটময় পরিস্থিতির হাল ধরার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করল আর এস এস। গত ৭ মার্চ ব্যাঙ্গালোর রাষ্ট্রোত্থান বিদ্যাকেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাধারণত সামাজিক জাগরণের যে কাজ সঙ্ঘ করে থাকে তার সঙ্গে রাজনীতি জড়িত নয়। যদিও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকরা বরাবরই স্বীয় উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। গত এক দশকে দেশব্যাপী চূড়ান্ত আর্থিক দুর্নীতি, দেশময় রাজনৈতিক সংকট, ভ্রান্ত বিদেশনীতির জন্য শত্রু পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষ, সংখ্যালঘু তোষণের নানাবিধ বিষময় পরিণাম (যার মধ্যে অনুপ্রবেশজনিত কারণে দেশের নিরাপত্তা-সংকটও রয়েছে) ইত্যাদি কারণে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন স্বয়ংসেবকদের 'পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের ভালো সুযোগ করে দিয়েছে' বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ গঠন করতে, দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আর এস এস তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে বলে সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ (ভাইয়াজী) যোশী জানিয়েছেন। এ-সংক্রান্ত সঙ্ঘের প্রতিবেদনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারকে 'পরিবর্তন' করে 'নতুন দেশপ্রেমী সরকার' গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে। সঙ্ঘের সহসরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে এই সরকারের অভিমুখ স্পষ্ট করে বলেছেন : 'নরেন্দ্র মোদী দেশের একজন শক্তিশালী নেতৃত্ব। তিনি নিজে একজন স্বয়ংসেবক এবং সেজন্য আমরা গর্ববোধ করি। দেশ পরিবর্তন চাইছে। তিনি গুজরাটে তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।'

সাংগঠনিকভাবে সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করার সেই ট্র্যাডিশন এবারে অক্ষুণ্ণ থাকলেও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যে হাত-পা গুটিয়ে আর চুপ করে বসে থাকবেন না ঠারেঠোরে আর এস এস নেতৃত্ব সেকথা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। কারণ স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এতবড় রাজনৈতিক সংকট ইতিপূর্বে আর কখনও আসেনি। সঙ্ঘের এই বৈঠকে বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং ও দলের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) রামলাল যোগাদান করেন। তবে কংগ্রেস আর তার দোসরদের আরও রক্তচাপ বাড়িয়ে আর এস এসের বিভিন্ন সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনও এই নির্বাচনকে উপলক্ষ করে নানান পরিকল্পনা নিচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদী 'ভারতের জন্য ভোট'-এর যে আহ্বান দেশবাসীর সামনে রেখেছেন ইতিপূর্বেই তার প্রভূত সাড়া পড়েছে। রাজনীতিকে এভাবে 'দলীয় শৃঙ্খলে'র অর্গলমুক্ত করে ভারত-প্রেমের যে পরাকাষ্ঠা মোদী দেখিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত স্বয়ংসেবকদের কাছে তা আন্তরিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কংগ্রেস বিরোধিতার পালে হাওয়া পেয়ে আপাতত তা সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছে।

সমকামিতা কিংবা সহবাসের সঙ্গে আপস নয় : আর এস এস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সমকামী অধিকার কিংবা সহবাসের মতো ভারতীয় পরম্পরার বিরোধী বিষয়ের সঙ্গে কোনও আপস নয়, এক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধই অগ্রাধিকার পাবে— স্পষ্ট করে এই বার্তা দিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। গত ৭ মার্চ ব্যাঙ্গালুরুতে ২০১৩-১৪ বর্ষে সাংগঠনিক কাজকর্মের বিবরণ উপস্থাপন করার সময় এধরনের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় আর এস এসের পক্ষ থেকে। সঙ্ঘ স্পষ্টই বলেছে, 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'কে বিকৃত করা সমর্থন-যোগ্য নয়। ব্যাঙ্গালুরু শহরের রাষ্ট্রত্থান বিদ্যা কেন্দ্রে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সংগঠনের শীর্ষ আধিকারিকেরা এই বৈঠকে যোগদান করেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে ২০১৪-য় দেশের সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ পাল্টাবে এবং একজন 'স্বয়ংসেবক' হিসেবে এই পাল্টানোর কান্ডারি হবেন নরেন্দ্র মোদী। সঙ্ঘের সরকার্যবাহ (সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক) সুরেশ (ভাইয়াজী) যোশী তাঁর প্রতিবেদনে বিষয়টি এইভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই নির্বাচন দেশবাসীর সামনে সুযোগ করে দিয়েছে বিদায়ী সরকারের গ্রহণযোগ্যতা, সততা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার। তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের একথাও বলেন যে, দেশের বর্তমান প্রধান বিরোধী দল যদি তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে তবে দেশের মানুষের পরিবর্তনের পক্ষে মতামত ভোটবাক্সে অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সমকামী অধিকার এবং সহবাসের মতো বিষয়টি উঠে আসে। শ্রীযোশীর বক্তব্য, 'বিগত বছরগুলিতে দু'টি ইস্যু আমাদের সমাজকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিল। প্রথমত, সহবাস সম্পর্ক ও দ্বিতীয়ত, সমকামিতা। এই ধরনের সম্পর্কের আইনি বৈধতার প্রশ্নে পক্ষে ও বিপক্ষে দুই মতই রয়েছে। কিন্তু আইনে পরিণত করার আগে আমাদের মাথায় রাখা দরকার এটা আমাদের সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী কু-প্রভাব বিস্তার করবে।' দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এব্যাপারে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পক্ষে রায় দিলেও শাসক-দল সহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল যেভাবে এনিয়ে তাদের হতাশা ব্যক্ত করেছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আর এস এস। তাদের বক্তব্য, আইনি রক্ষা-কবচ ব্যক্তি-মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দেশের জন্য নয়। বিশেষত সামাজিক মূল্যবোধ, ন্যায়-বিচার, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আইনের হাত-পা বাঁধা। তাই সামাজিক জীবনের সুরক্ষার জন্য ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবনা-চিন্তাই এক্ষেত্রে রক্ষা-কবচের কাজ করতে পারে।

ভোটকথা

- ভারতের ১৬তম সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ৮১.৫ কোটি। যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ২০১২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ২১.৯ কোটি ভোটার সংখ্যার প্রায় চার গুণ।
- ভারতে ভোটার সংখ্যা ২০০৯ সালের পর থেকে ৯.৭ কোটি বেড়েছে। এই বৃদ্ধি সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো দেশের ভোটার সংখ্যার তুলনায় বেশি। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল ও রাশিয়া।
- ১৯৫২ সালে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ১৭.৩ কোটি। বর্তমান ভোটার সংখ্যা এই সংখ্যার প্রায় পাঁচ গুণ।
- ভারতে মোট পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৪২.৭ কোটি (৫২.৩ শতাংশ)। মোট মহিলা ভোটার সংখ্যা ৩৮.৮ কোটি (৪৭.৬ শতাংশ), অন্যান্য ভোটার সংখ্যা ২৮,৩৪১।
- পশ্চিমবঙ্গে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৬,২৪,৬৮,৯৮৮। পশ্চিমবঙ্গে এবারে প্রথমবার ভোট দেবেন ২০,৭৯.৬৮৭ জন। এই নতুন ভোটারের প্রত্যেকের বয়স ১৮-১৯ বছরের মধ্যে।

তথ্য-প্রযুক্তি দুনিয়ায় দুর্দান্ত প্রভাব 'জয়েন আর এস এস'-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রচার বিমুখ সংগঠনটি আপাতত নিজগুণেই প্রচারের কেন্দ্রে। এছাড়া আর কী-ই বা ব্যাখ্যা হতে পারে এর? সঙ্ঘ বলতে সাতসকালে খাঁকি হাফপ্যান্টের একদল আবাল-বৃদ্ধ পাড়ার মধ্যে সশব্দ বা প্রয়োজনে নিঃশব্দ উপস্থিতি বোঝাতো তা আপাতত পাল্টাচ্ছে আজকের তথ্য-প্রযুক্তি দুনিয়ায়। আর এস এসের ওয়েবসাইটে 'জয়েন আর এস এস' বলে একটি সাইট রয়েছে, যেখানে সকালে শাখায় না গিয়েও আপনি সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন— সেখানে এই মুহূর্তে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। পরিসংখ্যান বলছে ২০১২ সালে 'জয়েন আর এস এস'-এর মাধ্যমে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ১২,১১৮ জন। গত বছরে এই সংখ্যাটাই গিয়ে দাঁড়ায় ৩১,১০২-তে। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা-র বৈঠকে এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে যুবক ও শিক্ষিত মানুষ 'জয়েন আর এস এস'-এর মাধ্যমে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। আর এস এসের প্রচার-বিমুখতা ও অন্তর্মুখিনতার সুযোগ নিয়ে একদল চক্রীর বহুযুগের অপপ্রচারও যে সঙ্ঘের সৌরভ ছড়ানোর পথে বাধা হতে পারলো না— তথ্য-প্রযুক্তির দুনিয়ায় সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতাই তার প্রমাণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

সংবাদ প্রতিবেদন

ইউপিএ আমলে আফগানিস্তানের চেয়েও বেশি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১০ বছরে গড় বোমা বিস্ফোরণে আফগানিস্তান, সিরিয়া, বাংলাদেশ ইত্যাদি অস্থির মৌলবাদী রাষ্ট্রগুলোকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে সোনিয়া-মনমোহন জুটি নিয়ন্ত্রিত ইউপিএ সরকার। এটা কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দলের অভিযোগ নয়, খোদ সরকারের নথিতেই উঠে এসেছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য। দুর্নীতি, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, টাকার দামের পতন, অর্থনৈতিক মন্দা তো ছিলই বা এখনও আছে, তার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস সরকারের কাঁটার মুকুটে যুক্ত হলো নতুন এই কাঁটা।

'ন্যাশনাল বোম্ব ডেটা সেন্টার'-এর পরিসংখ্যান বলছে— ২০১৩ সালে ভারতে মোট ২১২টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ আফগানিস্তানের চেয়ে ভারতে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। বাংলাদেশ ও সিরিয়া যেখানে কিনা রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছে সেখানে বিগত বছরে বোমা বিস্ফোরণের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৫টি ও ৩৬টি। ২০১৩-তে সরকারি হিসাব অনুযায়ী বোমার আঘাতে ভারতে নিহত হয়েছেন ১৩০ জন এবং আহতের সংখ্যা ৪৬৬, ২০১২-তে ভারতে মোট বিস্ফোরণের সংখ্যা ছিল ২৪১ যাতে নিহত হয়েছিলেন ১১৩ জন এবং আহত হয়েছিলেন মোট ৪১৯ জন।

সন্ত্রাস দমন এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে সরকার মুখে যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন, তাদের প্রকাশিত নথিতেই এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে— ইউপিএ আমলে আফগানিস্তানের চেয়েও বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ভারতীয়রা। ওই সরকারি নথিতে আরো দেখা যাচ্ছে— ২০০৪ সাল থেকে (যে বার কিনা ইউপিএ প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছিল) ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এ দেশে গড়ে ২৯৮টি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা গড়ে ১৩৩৭, যা কিনা আফগানিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ শেষ পাঁচ বছরের মধ্যে আফগানিস্তানে ২০১০ সালে সর্বোচ্চ ২০৯টি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। দেশব্যাপী বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের পরের দিনই বিদ্যুৎমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে রাতারাতি উত্তরণ ঘটেছিল যাঁর, সেই সুশীল কুমার সিন্দে এই বিষয়ে কি মন্তব্য করেন সেটাই এখন দেখার বিষয়।

জোটের ভাঙনে আর্থিক বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী বিহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নীতিশ জোট ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার পর বিহারে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) হার ক্রমশ কমছে। যেখানে ২০১২-১৩ সালে উৎপাদনের হার ছিল ১৫.০৫ শতাংশ, সেখানে ২০১৩-১৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮.৮২ শতাংশে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিজেপি-জেডিইউ যতদিন গাঁটছড়া বেঁধেছিল ততদিন বিহারের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হার ছিল স্থিতিশীল। বরং বলা যায়, বর্তমানে যে হার তার থেকে অনেকাংশে বেশি ছিল। কিন্তু গত বছর জুনের চলতি অর্থবর্ষের এক চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যেই জেডিইউ জোট থেকে বেরিয়ে আসায় ভাটা পড়তে শুরু করে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে। মধ্যপ্রদেশের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহ্বানের রাজ্যে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হার ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিকস অফিসের (সিএসও) তথ্য অনুযায়ী, ২০১১-১২ সালে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হার যেখানে ছিল ৯.৮৯ শতাংশ, সেখানে ২০১২- ১৩-তে তা বেড়ে হয়েছে ১১.৮ শতাংশ। ২০১১-১২-তে দেশের মধ্যে বিহার আয়ের দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। এমনকী অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হার ছিল ৯.৫৮ শতাংশ। যা ২০১০-১১-এর ১৪.৯৫ শতাংশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে তা অনেকাংশে কম।

পাশাপাশি, পাঞ্জাবের ২০১২-১৩ সালে যেখানে এই হার ছিল ৪.৭০ শতাংশ, তা বেড়ে ২০১৩-১৪-তে দাঁড়ায় ৫.৩০ শতাংশে। এক্ষেত্রে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল পাঞ্জাবের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যেখানে ১.৭৩ লক্ষ কোটি সেখানে বিহারে ছিল ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ পাঞ্জাবের তুলনায় কয়েক কদম এগিয়ে থেকেও অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে পাঞ্জাব অনেকাংশে পিছনে ফেলে দিয়েছে নীতিশের বিহারকে।

এনডিএ জোট কমপক্ষে ২৮০টি আসন পাবে

ভারতের সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাসে এবারই প্রথম দীর্ঘতম নির্বাচন হতে চলেছে। ৭ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ৯ দফায় ভোট হবে। শেষ দফা ১২ মে। গণনা ১৬ মে। অর্থাৎ ওইদিনই বোঝা যাবে দেশের মানুষ কী চাইছেন। নরেন্দ্রভাই মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার। অথবা আঞ্চলিক দলের দুর্বল দিশাহীন খিচুড়ি সরকার। অথবা ত্রিশঙ্কু কেন্দ্র। যেখানে কেউই সরকার গড়তে পারবে না। হ্যাঁ, এই তিনটি সম্ভাবনাই আছে। দক্ষিণের তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগাম শুভেচ্ছাও তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন দিদি। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে জয়ললিতার এ আই ডি এম কে দল তামিলনাড়ুর ৩৯ টি লোকসভার আসনই দখল করেছে তবুও কী তিনি কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারবেন? এর উত্তর, না। দেশের সমস্ত আঞ্চলিক দল সম্মিলিতভাবে যত ভাল ফলই করুক না কেন তারা ম্যাজিক ফিগার ২৭২টি আসন পাবে না। সহজ অঙ্কের হিসাবেই পেতে পারে না। সেক্ষেত্রে সরকার গড়তে তাদের কংগ্রেসের 'হাত' ধরতে হবে। অর্থাৎ বকলমে কেন্দ্রে আবার কংগ্রেস রাজ চলবে। ক্ষমতার লোভে দিল্লীতে আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল কংগ্রেসের হাত ধরেছিলেন। মাত্র ৪৯ দিনের মধ্যেই দিল্লীর সেই সরকার মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের হাত ধরলে একই অবস্থা হবে আঞ্চলিক দলের আদর্শহীন জগাখিচুড়ি সরকারের। আবার দেশজুড়ে নির্বাচন। দুটি নির্বাচনের অর্থ ২০-২৫ হাজার কোটি টাকা বেকার হয়ে যাবে। ভারতের আর্থিক কাঠামোটাই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, গণতান্ত্রিক বিশ্বে সবচেয়ে বড় সাধারণ নির্বাচন হয় ভারতে। এবার মোট ৮১ কোটি ৫০ লক্ষ ভোটদাতা ভোট দেবেন। দ্বিতীয় স্থানে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে ভোট দেন ২১ কোটি ৯০ লক্ষ ভোটদাতা। তাই ভোট দেওয়াটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক তরুণ-তরুণীদের বলতে শুনেছি যে তাঁরা দেশের সব রাজনৈতিক দলকেই দুর্নীতিপরায়ণ বলে মনে করেন। তাই তাঁরা এবার 'নোটা'-র বোতাম টিপবেন। মানে, কাউকেই ভোট দিচ্ছি না। এই প্রবণতা চরম স্বার্থপরতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। আমায় কেউ কিছু পাইয়ে দিচ্ছে না তাই আমি কাউকে ভোট দেব না। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার দুর্নীতিপরায়ণ ছিল বলেই দেশের সব রাজনৈতিক দলই দুর্নীতিপরায়ণ এতটা সরলীকরণ ব্যক্তি-স্বার্থসর্বস্ব মানুষই করতে পারে। তাই দেশের নবীন ভোটদাতাদের কাছে আমার

গূঢ়পুরুষের
▢
কলম

যে সাতটি রাজ্যের নির্বাচনী সাফল্যে নির্ভর করবে কেন্দ্রে এনডিএ সরকার গঠন।

(১) উত্তরপ্রদেশ। আসন সংখ্যা ৮০। বিজেপি এবং তার শরিকদের ৪৫টি আসন জেতার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই রাজ্যে এবার হিন্দু ভোট সুসংগঠিত। তাঁরা 'কমল' চিহ্নকেই বেছে নিচ্ছেন।

(২) মহারাষ্ট্র। আসন ৪৮টি। রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস—এনসিপি-জোটের প্রতি সাধারণ মানুষ আস্থা হারিয়েছেন। দুই জোট শরিকের সম্পর্ক এখন তলানিতে ঠেকেছে। ছন্নছাড়া এই জোট নির্বাচনে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। মোদী ঝড়ে শুকনো ঝরা পাতার মতোই কংগ্রেসকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজেপি-শিবসেনা জোট ৪০টি আসন জিততে পারে।

(৩) অন্ধ্রপ্রদেশ। আসন ৪২টি। তেলেঙ্গনা ইস্যুতে সীমান্ত অঞ্চলে কংগ্রেস মুছে যাবে। জগন রেড্ডি, চন্দ্রবাবু নাইডু এবং বিজেপি অন্ধ্রে সাফল্য পাবে।

(৪) বিহার। আসন ৪০। একদা বিজেপি-র জোট সঙ্গী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার নরেন্দ্র মোদীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। জাতপাতের রাজনীতির কথা ভুলে এবার রাজ্যের হিন্দু ভোট সংগঠিতভাবে বিজেপি-র ভোট বাক্সে যাচ্ছে। তাছাড়া রামবিলাস পাশোয়ান এনডিএ-তে যোগ দেওয়ায় দলিত ভোটও পাওয়া যাবে।

(৫) কর্ণাটক। আসন ২৮টি। গত ২০১৩-র বিধানসভার নির্বাচনে এই রাজ্যে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ২০০৯-এর লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি একাই ১৯টি আসন জেতে। এবার রাজ্যের লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় নেতা ইয়েদুরাপ্পা বিজেপিতে ফিরেছেন। প্রায় বিরোধী শূন্য কর্ণাটকে বিজেপি ২৫-২৬টি আসন পেলে অবাক হবেন না।

(৬) গুজরাট। আসন ২৬। এই রাজ্যে কংগ্রেসকে খুঁজতে এখন অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগবে। গুজরাটের ২৬টি আসনই বিজেপি দখল করতে চলেছে।

(৭) মধ্যপ্রদেশ। আসন ২৯টি। মিডিয়ার জনমত সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে এই রাজ্যে বিজেপি একাই ২৪টি আসন জিতবে। সাম্প্রতিক বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের ছন্নছাড়া অবস্থা প্রকাশ্যে দেখা গেছে।

বিনীত নিবেদন, শত প্ররোচনাতেও ‘নোটা’-র বোতাম টিপবেন না। আঞ্চলিক দলের প্রার্থীদের নয়, আপনার পছন্দের এবং বিশ্বাসের জাতীয় দলের প্রার্থীদেরই ভোট দিন। দেশকে ভোট দিন। নিজের নিজের রাজ্যের স্বার্থ দেখবেন বিধানসভার ভোটে। দেশের স্বার্থরক্ষায় জাতীয় দলকে ভোট দিন লোকসভার নির্বাচনে। এবার সাধারণ নির্বাচনে প্রথমবার ভোট দেবেন ৯ কোটি ৭০ লক্ষ নবীন ভোটদাতা। এই নবীন ভোটদাতারাই দেশের ভাগ্য নির্ণয় করবেন। কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে তাঁরাই কান্ডারি।

এবার নির্বাচনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং সরকারি প্রশাসনের সর্বস্তরেই দুর্নীতি প্রধান দুটি বিষয়। কংগ্রেসের বিগত ১০ বছরের অপশাসনে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এই কারণেই এবার স্বাধীনতাউত্তর নির্বাচনের ইতিহাসে সর্বনিম্ন জেতার রেকর্ড গড়তে চলেছে। গত ডিসেম্বরে পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে এমন ফলাফলেরই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। কংগ্রেস দেশকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। এই চোরাবালির মরণ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন। যে সরকার কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা রুদ্ধ করবে। দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসনের মাধ্যমে তার সুফল আম জনতার কাছে পৌঁছে দেবে। বাজারে যদি অঢেল কৃষিজাত পণ্য আসে তবে তার দাম কমতে বাধ্য। এটি অর্থনীতির একেবারে প্রাথমিক সূত্র। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই কর্মসংস্থান সম্ভব। দ্বিতীয় অন্য পথ নেই।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

এই দুটি ক্ষেত্রেই নরেন্দ্রভাই মোদী গুজরাটে করে দেখিয়েছেন। বিশ্বব্যাপী মন্দার ধাক্কা তিনি গুজরাটের অর্থনীতিতে লাগাতে দেননি। মহারাষ্ট্রের মতো শিল্প প্রধান রাজ্যে যখন বড় বড় শিল্পসংস্থা ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই করেছে, তখন গুজরাটের শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা নিরাপদে নিশ্চিন্তে দিন

কাটিয়েছেন। এরপরেও যখন মমতা নরেন্দ্রভাই দামোদরভাই মোদীকে দাঙ্গাবাজ বলেন তখন ঘৃণায় মনটা ভরে যায়। দিদির আড়াই বছরের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গে একটিও শিল্প কারখানা হয়নি।

সংবাদমাধ্যমের জনমত সমীক্ষা রিপোর্ট যাই বলুক না কেন, বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ জোট এবার কমপক্ষে ২৮০টি আসন পাবে। যে সমস্ত রাজ্যে বিজেপি-র জোট অভূতপূর্ব ভাল ফল করবে সেগুলি হলো গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, বিহার উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল ও উত্তরাখণ্ড। এইসব রাজ্যে কংগ্রেস মুছে গেছে। বিজেপি-র শরিক আকালি দল পাঞ্জাবে যথেষ্ট শক্তিশালী।

এই সঙ্গে মোদী ঝড়ের যোগ মানে অমৃত যোগ। তবে একটা কথা রাজনীতিতে খুবই চলে। জয় নিশ্চিত জানলেও বিরোধী পক্ষকে তুচ্ছ করা ভুল। কথায় আছে, ‘ডোন্ট-আন্ডারএস্টিমেন্ট ইয়োর রাইভালস্।’ বিজেপি-র প্রচার কর্মীদের প্রাণপণ খাটতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানুষের আবেগকে ভোটে পরিবর্তিত করতে গেলে ভোটদাতাদের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। তবেই মোদী ঝড়ের ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হবে। দেশ বাঁচবে। মানুষ বাঁচবে।

শিল্পে এগিয়ে গুরজাট, হরিয়ানা, পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদিত একটি দলের সমীক্ষায় শিল্পোন্নত রাজ্যগুলির মধ্যে হরিয়ানা, গুজরাট, ও মধ্যপ্রদেশের নাম উঠে এসেছে। এছাড়াও চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে রয়েছে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ। মূলত শিল্পে উন্নত প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে দু’টি কংগ্রেস শাসিত রাজ্য। যেমন— অন্ধ্রপ্রদেশ এবং হরিয়ানা, আবার গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশের শাসন ক্ষমতা বিজেপি-র হাতে। আর ওড়িশা বিজেডি সরকারের জিম্মায়।

প্রথম পাঁচ রাজ্যকে সরিয়ে রাখলে বিহার, কেরল, রাজস্থান, তামিলনাড়ুর অবস্থান যথাক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম স্থানে। আবার অন্যদিকে, শিল্পের উপযোগী হিসেবে পরিচিত মহারাষ্ট্রের স্থান শেষ পাঁচে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জোয়ার এসেছে বলে দাবি করা হলেও তৃণমূল শাসিত এই রাজ্য রয়েছে একেবারে পিছনের সারিতে।

প্রেমে, রণে, ভোটে নীতিকে বুড়ো আঙুল জয় অগণতন্ত্রের জয়

শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী
কংগ্রেস সুপ্রিমো
১০ নম্বর জনপথ, নয়াদিল্লী

ম্যাডাম,

জানি এখন আপনি খুব ব্যস্ত। নিজেকে জিততে হবে। ছেলেকে জেতাতে হবে। তবু এই সময় আপনার একটু সময় নষ্ট করতে এই চিঠি। শুধু নিজে বা ছেলে নয়, দলের বাকিরা জিতুক বা হারুক তাতেও অবশ্য আপনার এসে যায়। কংগ্রেস বলে দলটার দেমাক তো বজায় রাখতে হবে। তাই কুড়িয়ে বাড়িয়ে যেটুকু আসন পাওয়া যায় তা দিয়ে কমপক্ষে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদাটুকুতে ছিনিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া শেষ বেলায় কেনাকাটার রাস্তা তো খোলা আছেই। ক্ষমতা যে হাতছাড়া সেটা আপনি হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছেন। সরি পেয়েছেন। অনেক আগেই পেয়েছেন। তাই তো ছেলেকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করতে করতেও আঁচলের তলায় ঢুকিয়ে নিয়েছেন। অমন ছেলেকে যে সর্বসমক্ষে এখনই প্রেজেন্ট করা যায় না তা আপনি জানেন।

যাক, যে কারণে এই চিঠি এবার সরাসরি তাতেই প্রবেশ করা যাক। গত দশটা বছর আপনার আঙুলের নাচে কেন্দ্রের সরকার যেভাবে চলেছে তাতে নীতির কোনও বালাই ছিল না। সংখ্যালঘু সরকার নিয়ে চালিয়ে তো দিলেন।

কিন্তু ম্যাডাম, একটা ব্যাপারে কিছু না বলেই পারছি না। হতে পারে আপনি ইটালি তনয়া কিন্তু ভারত নামক বিশাল গণতান্ত্রিক দেশের পুত্রবধূ তো বটে। আর সেই পরিচয় নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগও তো কম করলেন না। তাই আপনার কাছে দেশ একটু নীতিরক্ষা, মানে সংবিধানের সম্মান রক্ষা আশা করে। আমিও করি। তবু আপনি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদ রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যপালের আসন নিয়ে যে ছেলেখেলা করছেন তাতে আপত্তি না তুলে পারছি না। যদিও আপনি যা করেছেন বেশ করেছেন।

সামনে ভোট। এখন হচ্ছে ক্ষমতা দখলের সেরা মরশুম। আপনার দেখানো মধুতে একজন নির্বাচনে লড়ার জন্য আপনার হাত ধরতে রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। আহা কী আনন্দ! অন্যদিকে একজন রাজনৈতিক লড়াইতে গো হারান হেরে সেই রাজ্যপালের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আহা আহা, মরি মরি!

প্রথমজন নিখিল কুমার। জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে কেরলের মহামহিম রাজ্যপালের পদ ছেড়ে দিলেন। বিহারে তিনি 'হাত' তুলে নাচবেন, সরি ভোটে লড়বেন। অন্যদিকে শ্রীমতি শীলা দীক্ষিত। তিনি পনের বছর দিল্লী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু যেই দেশে বিকল্প হাওয়া তৈরি করল বিজেপি, তেমনি রাজ্যের মানুষেরা তাঁকে রীতিমতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। শুধু তাঁর সরকার নয়, তাঁকেও গোহারান হারিয়েছেন। কিন্তু শীলা যে আপনার বড় ভক্ত। তাই কেরলে নিখিল কুমারের ফাঁকা আসনটা তাঁকে পুরস্কার হিসেবে তুলে দেওয়া যাক। যেমন ভাবা তেমন কাজ। জনতার রায়ে নির্বাসিত শীলা এখন মহামহিম রাজ্যপাল।

এ আর এমন কি। আপনার শ্বাশুড়ি-মা ইন্দিরা গান্ধীই তো এই রাস্তা দেখিয়েছেন দেশকে। বৃটেনের যে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের আদলে ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থা সেই ওয়েস্টমিনিস্টার ব্যবস্থায় 'হাউস অব লর্ডস' (যা আমাদের রাজ্যপালের মতো) রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন না। অথচ আপনার শ্বাশুড়ি-মা সেসবকে কাঁচকলা দেখিয়ে ক্ষমতার অবব্যবহার করে একের পর এক রাজ্যে রাজ্যপালের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক আসনে বসিয়েছেন তাঁর আনুগতদের। শুধু অনুগতরাই নন, অনেক সময় 'হেরো' রাজনীতিক এবং দলের পক্ষে 'বিপজ্জনক' রাজনীতিকেও পুনর্বাসন প্যাকেজ দেওয়া হয় রাজ্যপাল হিসেবে। তাঁর কাছেই শপথ নেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ গোটা মন্ত্রিসভা। আহা কী আনন্দ!

ইন্দিরা তথা কংগ্রেস কালচারের সেই অগণতান্ত্রিক কায়দা রুখতে এদেশেও কম দাবি ওঠেনি। সরকার ঘটা করে 'সারকারিয়া কমিশন' গঠন করে। সেই কমিশনের রায়ে বলা হয়েছিল, রাজনীতি করা ব্যক্তিদের পারতপক্ষে রাজ্যপালের চেয়ারে বসানো যাবে না। আর একবার রাজ্যপাল হয়ে গেল তাঁর ফের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নৈব নৈব চ। কিন্তু কোথায় কি? সেই কমিশনের নির্দেশ কার্যকর করার যে ন্যূনতম ইচ্ছা কংগ্রেস শাসকদের নেই তা ফের 'নিখিল-শীলা' কাণ্ডে বুঝিয়ে দিলেন সোনিয়াজি। পারিবারিক পরম্পরা বজার রাখার জন্য আপনাকে বিপ্লবী থুরি গৈরিক অভিনন্দন।

সোনিয়াজি, যেই যা বলুক আমি জানি আপনার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। তাই আপনি অনেক আগেই বুঝেছিলেন দশ বছরে দেশের দশা খারাপ করার পর লোকসভা নির্বাচনে আপনাদের এবার জনতা আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলবে। তবু একে ভাঙিয়ে, ওকে কিনে সরকার গঠনে পারদর্শী কংগ্রেসের সুপ্রিমো হিসেবে আপনি হাল ছাড়েননি। তাই সোনিয়াজি আপনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভোটের বাজারে আমার স্লোগান, 'জয় অগণতন্ত্রের জয়'।

— **সুন্দর মৌলিক**

মমতার হাত ধরে আন্না কি চাণক্য হয়ে উঠতে চাইছেন ?

সাধন কুমার পাল

আন্না হাজারের মুখে মমতার প্রশংসা শুনে অনেকদিন আগে শোনা একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। জেলার পূর্ত দপ্তরে বদলির পর একজন সৎ ইঞ্জিনিয়ার এসে যাওয়াতে ঠিকাদাররা প্রমাদ গুনলেন। লোভ, ভয় আদি কোনো ঔষধেই ওই ইঞ্জিনিয়ারকে বশে আনা যাচ্ছে না। নয়-ছয় প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে।

এক মঞ্চে আন্না ও মমতা। (ফাইল চিত্র)

এরকম পরিস্থিতিতে সবাই অবাক হয়ে দেখল ওই এলাকার সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত একজন ঠিকাদার ওই ইঞ্জিনিয়ারের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর কাউকে বিশ্বাস না করলেও সততার প্রতীক ওই ইঞ্জিনিয়ার দুর্নীতিগ্রস্ত ওই ঠিকাদারটিকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেন এমন ধারণা জনমানসে প্রোথিত হয়ে গেল। রহস্য উদ্‌ঘাটনে নেমে দেখা গেল, দুর্নীতিগ্রস্ত ওই ঠিকাদারটি দিনের পর দিন চোখ রাখতে রাখতে বুঝতে পারলো ঈশ্বর বিশ্বাসী ওই ইঞ্জিনিয়ারের এক মাত্র দুর্বলতা বলতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। যত ব্যস্ততাই থাক না কেন ভিড় ঠেলে বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হলেও স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে ঠাকুরের উদ্দেশে পুজো দেওয়া ইঞ্জিনিয়ারের আবশ্যিক রুটিনের মধ্যে পড়ে। ব্যস, আর যায় কোথায়, ওই ঠিকাদারও প্রতিদিনই কাজকর্ম ফেলে ঠাকুরের পুজো দিতে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলেন। প্রতিদিনই আগেভাগে গিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন যাতে লাইনে ইঞ্জিনিয়ারের সাহেবের ঠিক আগে বা পরে দাঁড়িয়ে ঠাকুর সম্পর্কে অতিভক্তি মূলক দু'চার কথা বলে এটা প্রমাণ করা যায় যে উনি ঠাকুরঅন্ত প্রাণ একজন বড় মাপের ঠাকুর ভক্ত। এভাবেই আলাপ জমল। একদিন কোনো এক বাহানায় ঠাকুরের এক বিশাল সুদৃশ্য ছবি নিয়ে ঠিকাদার হাজির হলেন ওই ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোয়। ঠাকুরের ছবি হাতে পেয়ে সাহেব ভাবলেন এটা ঠাকুরেরই মহিমা। না হলে অযাচিতভাবে এই লোক ঠাকুরের ছবি নিয়ে আসবে কেন। সরল বিশ্বাসে ওই ঠিকাদারকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভেবে ছবিটি গ্রহণ করলেন। ব্যস, এরপর থেকে বিল পাশ করাতে বা কোনো লাভজনক বরাত পাওয়ার জন্য ওই ঠিকাদারকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

মমতাও খুব সম্ভবত ওই ঠিকাদারের মতো একই কৌশলে আন্না হাজারেকে বশ করেছেন। টালির ঘর নিবাসী, আটপৌরে শাড়ি ও হাওয়াই চপ্পলের মতো অনাড়ম্বর পোশাকে শোভিত মুখ্যমন্ত্রী পদমর্যাদার একজন মহিলা পায়ে হাত দিয়ে প্রণামই যে আন্নার মতো সাদাসিধে মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট— মমতার মতো পোড় খাওয়া রাজনীতিকের পক্ষে এটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। টেলিভিশনের দৌলতে মানুষ দেখেছে ক্যামেরার সামনে মমতা আন্নার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই আন্না হাজারে ভাবে গদগদ হয়ে যা বললেন তার সারমর্ম হলো মমতা 'সও' (একশত) সিট পেলেই নাকি দেশের চেহারাই বদলে যাবে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর গদিতে তিনি মমতাকে দেখতে চান। মমতার প্রণাম পেয়ে আবেগের ভারসাম্য না হারালে আন্নাজী এরকম ঘোষণা করতে পারতেন না। কারণ একটি শিশুও বোঝে যে তৃণমূল কংগ্রেসের মতো একটি আঞ্চলিক দল একশত সিট পাওয়া মানে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হওয়া। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মমতাও ঘোষণা করে দিলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আন্নাজীর ইচ্ছে মতোই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী চূড়ান্ত করবে।

গত ৩০ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশে মমতা হাজির করিয়েছিলেন বিশিষ্ট লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীকে। টিভির দৌলতে সবাই

দেখলো মমতা নিজে একটি খাম তুলে দিলেন মহাশ্বেতা দেবীর হাতে। খাম খুলে মহাশ্বেতা দেবী একটি কাগজ হাতে নিয়ে একটি লেখা পাঠ করলেন যার মর্মার্থ হলো তিনি মমতাময়ী মমতাকে প্রধামন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। বিশ্লেষকদের অনেকের মতে মমতার হাতে কিছুদিন আগে রাজ্যের দেওয়া পুরস্কার তুলে নিয়ে মহাশ্বেতা যে ঋণে আবদ্ধ হয়েছিলেন ব্রিগেড সেই মমতার হাতে মমতারই মনের ইচ্ছেবাহী খাম তুলে নিয়ে তা পাঠ করে সেই ঋণ পরিশোধ করলেন।

এই বিশ্লেষণ সত্য হলে বলতে হবে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্যই মমতা এই সমস্ত বিশিষ্টজনদের পুরস্কৃত করেছেন এবং এই সূত্র ধরে বলা যায় অদূর ভবিষ্যতে আন্না হাজারেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কোনো না কোনো পুরস্কারে ভূষিত হতে চলেছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে যে মমতা এক সময় আন্না হাজারেকে 'আর না' বলে কটাক্ষ করেছিলেন সেই মমতা হঠাৎ করে আন্নার পায়ের ধুলো মাথায় নিতে গেলেন কেন? এই প্রশ্নের অনেক রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থাকতে পারে। তবে আমার মনে হয় নির্বাচন পূর্ব বিভিন্ন সমীক্ষার ফলে এটা পরিষ্কার যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উঠতে চলেছে ব্যাপক মোদী ঝড়। এই ঝড়ের সামনে সর্বভারতীয় স্তরে অস্তিত্বের সঙ্কটের পাশাপাশি নিজেদের রাজ্যেও প্রভাব কমার আশঙ্কায় ভুগছে মমতার তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক দল। পরিস্থিতি এমনই যে জেতার সম্ভবনার কথা তো দূরের কথা কংগ্রেস কতটা খারাপ ভাবে হারবে তারই আগাম সম্ভাবনা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ এখন দেশজুড়ে।

এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস-বিরোধী এই ঝড়ো হাওয়ার সবটাই যেন মোদীর পালে না লাগে তার জন্য কংগ্রেসী ম্যানেজাররা সক্রিয় হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। ফলে মোদীর জয়যাত্রা ভঙ্গ করার জন্য সর্বভারতীয় স্তরে মমতা বা কেজরিওয়ালের মতো আঞ্চলিক নেতাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে তোলার পিছনে কংগ্রেসী ম্যানেজারদের হাত থাকার সম্ভাবনা থাকাটাই বোধহয় স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া কংগ্রেসী ঘরানায় মমতা হতাশ কংগ্রেসীদের ভোটে ভাগ বসিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে গুরুত্ব লাভের এমনকী মওকা বুঝে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। সব মিলে এটা বোধহয় বলা যায় মোদী-বিরোধী কংগ্রেসী ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই পোড় খাওয়া এই নেত্রীকে আন্নার পায়ে মাথা ঠুকতে বাধ্য করছে।

আরো যে প্রশ্নটি সবাইকে ভাবাবে তা হলো আন্নার মতো একজন অভিজ্ঞ মানুষ রাজনীতির এই সমস্ত সহজ অঙ্ক কি একেবারেই বুঝতে পারলেন না? না কি সব বুঝেসুঝেই সহজ সরল জীবনযাপনের বাহানায় মমতার মতো এক আঞ্চলিক নেত্রীকে শক্তিশালী করে জাতীয় স্তরে স্থিতিশীলতার বদলে অস্থির জোট রাজনীতির সার্কাস তৈরি করে চাণক্যর মতো ক্ষমতার পরোক্ষ রাশ নিজের হাতে পাওয়ার তাড়নায় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সমর্থনের পদক্ষেপ নিলেন? আমার মনে হয় সমস্ত কিছু বুঝেসুঝেই নিজের জনসম্মোহন ক্ষমতা সম্পর্কে মোহগ্রস্ত ও উচ্চ ধারণার শিকার আন্না হাজারে আরো একবার নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়ার জন্য মমতার হাত ধরে থাকতে পারেন। আন্নার কথা অনুসারে তিনি নাকি সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে ১৭ দফা দাবি সম্বলিত চিঠি পাঠিয়েও মমতা ছাড়া আর কারো কাছে উত্তর পাননি। হতে পারে চিঠির উত্তর না দেওয়ার দুঃসাহসী দলগুলিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার সুপ্ত বাসনা আন্নার মনে জেগে থাকতে পারে। 'সরল জীবন যাপনের প্রতীক' মমতার প্রণাম তোফা সেই বাসনাকে সাকার করার স্বপ্ন জাগিয়ে থাকতে পারে আন্নার মনে। গান্ধীবাদী আন্না ওঁর এই ধরনের বাসনা পূরণের মধ্যে হয়তো কোনো অন্যায় দেখছেন না। কারণ ইতিহাস বলছে স্বয়ং গান্ধীজীও এক সময় নিজের সর্বাধিনায়কত্ব বজায় রাখার জন্য দেশের স্বার্থ, যোগ্যতা, জনপ্রিয়তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জায়গায় তোষামোদে 'কাছের লোক' পট্টভি সীতারামাইয়াকে কংগ্রেস সভাপতি পদে বসিয়েছিলেন।

আন্না হাজারের হিসেব কতটা সঠিক তা লোকসভা নির্বাচনের পরেই স্পষ্ট হবে। তবে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার আশ্বাস বহনকারী পরিস্থিতির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মমতার প্রণামে বিগলিত আন্না নিজের জনপ্রিয়তার ইগো পরিতৃপ্তির জন্য সুখে দুঃখে ওঁর পাশে থাকা মানুষগুলির রাজনৈতিক ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে যে অবস্থান নিলেন তা বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা হিসেবেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ লোকপালের দাবিতে রামলীলা ময়দানে অনশনরত আন্নার মঞ্চের চারদিকে ব্যাপক জনসমাগম ঘটানোর ইতিহাস আসলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও সঙ্ঘানুবর্তী সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত নাগরিকদের যারা কিনা এই সমাজকর্মীর ভাবনাকে নিজেদের সমগোত্রীয় ভাবনা বলে মনে করে— তাদের পরিশ্রমের ইতিহাস। আজ সঙ্ঘানুবর্তী এই বিশাল নাগরিক সমাজ যেখানে কংগ্রেস-মুক্ত ভারত গড়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন সেখানে আন্না নেমেছেন আরেক কংগ্রেসীকে শক্তিশালী করে দেখানোর ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতায়। সব মিলে এটা বোধহয় বলা যায় যে দেশের স্বার্থ নয়, আন্নার মতো সমাজকর্মীর ক্ষমতা প্রদর্শন ও মমতার মতো রাজনীতিকের ক্ষমতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষার সমীকরণই আন্না-মমতাকে এক মঞ্চে এনেছে।

অতীতে শক্তিশালী আঞ্চলিক দলের হাত ধরে জাতীয় রাজনীতিতে মঞ্চস্থ হরেক কিসিমের সার্কাস, অতি সম্প্রতি দিল্লী বিধানসভায় কেজরিওয়াল সার্কাস দেখে তিতিবিরক্ত মানুষের রায় বানপ্রস্থী আন্নাকে সন্ন্যাসে আর কংগ্রেসী ঘরানায় মমতাকে সোনিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক সহমরণে পাঠাবে কিনা তা জানার জন্য আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

ভারত উত্তরণের এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ও তাঁর নেপথ্য বাহিনী

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে হিন্দী, ইংরেজি ও নানান প্রাদেশিক ভাষার বিভিন্ন চ্যানেলগুলিতে আসন্ন লোকসভা ভোটের আগাম জনমত সমীক্ষার যে ইঙ্গিত উঠে আসছে তাতে একটি বিষয়ে সহজ সাদৃশ্য রয়েছে। সব সমীক্ষাতেই প্রভাত থেকে মধ্যাহ্নে যাওয়ার গতিপথে সূর্যদেবের তেজ যেমন ক্রমশই তীব্র মাত্রা ধারণ করে, বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্রভাই মোদীর সমর্থন ও জনপ্রিয়তা ঠিক তেমনই অপ্রতিরোধ্য গতিতে ধাবমান। সেইসঙ্গে বিজেপি-র সামগ্রিক আসন বৃদ্ধির ধারাও এগোচ্ছে একই লয়ে। মনে রাখতে হবে, সর্বভারতীয় এই প্রচারমাধ্যমগুলির হাতেগোনা কেউ কেউ হয়ত দলের প্রতি দুর্বলতা রাখলেও এঁরা প্রধানত দেশের 'সাম্প্রদায়িক শক্তির' আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার 'মতলবি আতঙ্কে' সদা সন্ত্রস্ত থাকেন। তবে আকাশের মেঘভাঙা বৃষ্টি (cloud burst) যেমন রুখে দেওয়া যায় না, ধূমকেতুর চলার পথে যেমন বাধা উড়ে যায়, আজকে মোদীর ক্রমিক উত্থান ও তজ্জনিত কারণে আপামর দেশবাসীর মধ্যে যে আলোড়ন উঠেছে তা যে-কোনো খোলা চোখে ধরা পড়ছে— তাতে বাজার ও জনরুচি বিশেষজ্ঞ এই সব 'ধর্মনিরপেক্ষী' চ্যানেল বিশেষজ্ঞরা আর নিজেদের ধরে রাখতে পারছেন না। তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সমীক্ষা প্রকাশ করছেন। তা আবার পরের দিনের সংবাদপত্রের হেডলাইন হয়ে যাচ্ছে। মোদীজীর 'চায়ে পে চর্চা'র মতো দেশবাসীর মধ্যে এক আসন্ন অগ্ন্যুৎপাতের অনুভূতির উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। মোদীর সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি মোবাইল ফোনের

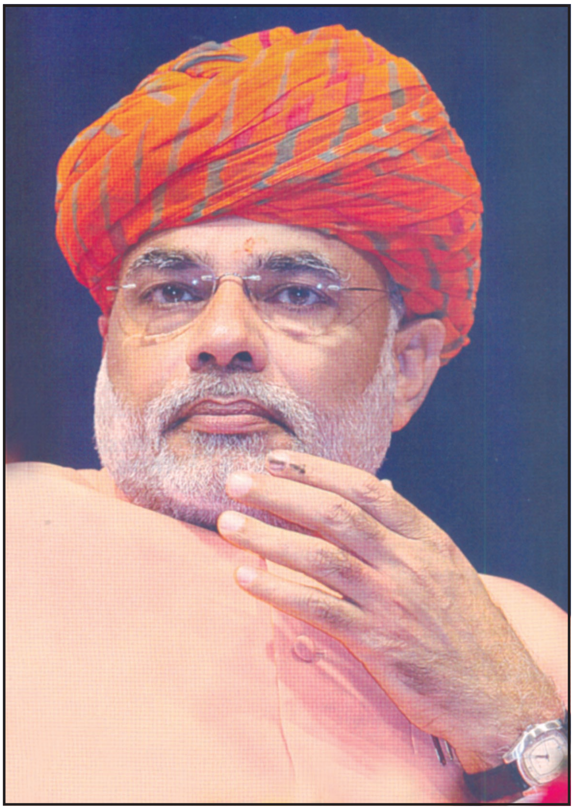

'মোদী আনে ওয়ালা হ্যায়'-এর কলার টিউন মানুষ আজ শুনতে উদ্গ্রীব। এবার ভাবতে হবে প্রচারের এই তড়িদ্‌গতি দেশব্যাপী ছড়িয়ে যাওয়ার পদ্ধতি তো ২০০৪ সালেও (তৎকালীন প্রযুক্তি অনুযায়ী) দেশ দেখেছে। ঠিক একইরকম তিনটি রাজ্যে নির্বাচনী সাফল্যের নিরিখে দল ভোট এগিয়ে আনার মতো আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছিল। তখনকার তরুণ নেতা প্রমোদ মহাজনের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়া সাইনিং' প্রচারের কথা নিশ্চয় মনে পড়বে। দেশের মধ্যে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, অর্থনীতিকে ঘিরে ইতিবাচক বাতাবরণ, মূল্যস্তর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, জিডিপি-র রেকর্ড ঊর্ধ্বগতি, শেয়ার বাজারের ঊর্ধ্বমুখিতা এসবই প্রচারের অভিমুখ হিসেবে ধরা হয়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজীর রেকর্ড করা কণ্ঠস্বরও ছড়িয়ে পড়েছিল দূরভাষ যন্ত্রগুলিতে। সেবারও দেশব্যাপী প্রচারমাধ্যমগুলি পূর্বাভাস ছিল এনডিএ-র বিজয়ী হওয়ার। বাস্তবে দল পরাজিত হয়েছিল।

এবার আর সেবার

কিন্তু এবারের সঙ্গে সেবারের তফাত ১০ বছরের। পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে এমন পচা গলা, দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ তলিয়ে যাওয়া কংগ্রেস ও তার দলাল সেবার মানুষের চোখের সামনে পূতিগন্ধ ছড়ায়নি। দেশ এমন থমকে দাঁড়ায়নি। এই বিষয়গুলিই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে মানুষের কাছে তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তুলে ধরছেন বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। গতবারের প্রচার ছিল যাকে বলে অনেকটাই সাবজেকটিভ। মোদীজী একবারে সর্বাধুনিক কৃৎকৌশলে আস্থাবান। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তো আছেই, প্রতিটি রাজ্যের পরিস্থিতি ও তথ্য ধরে ধরে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক বক্তব্যগুলিকে জনতার মনের গভীরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। দেখাচ্ছেন নির্দিষ্ট উত্তরণের পন্থা। তাঁর প্রতিটি ভাষণই মানুষের কাছে উদ্দীপনাময়, বিশ্বাসযোগ্য। তার সবটাই ইতিবাচক। নেতিবাচক

মনোভাব মোদীর অভিধানে নেই। তাঁর তথ্য পরিসংখ্যানকে খণ্ডন করা ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠছে। কিন্তু কীভাবে এই এলাহি তথ্যসম্ভার সংগৃহীত হচ্ছে? কীভাবেই-বা প্রতিটি ভাষণের গতিমুখ একে অপরটির থেকে আলাদা মাত্রা পাচ্ছে তার দিকেই আমরা নজর দেব।

যুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবিলা

এক নজরে দেখলে আন্দাজ পাওয়া যাবে মোদীর প্রচার পরিকল্পনা বাস্তবে মাকড়সার মতো দেশের নানান গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে দীর্ঘ জাল বিস্তার করেছে। যেমন ধরুন, উত্তরপ্রদেশে থিতু হয়ে থাকা অমিত শাহ। তাঁকে রাজনৈতিক সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক (Political Chief of Staff) বলে অভিহিত করা হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে দিল্লীতে অবস্থিত সর্বশেষ তথ্যে সমৃদ্ধ আই টি সেল যারা আবার গান্ধীনগর ও মুম্বাইতে ব্যস্ত স্বাধীন তথ্য ভাণ্ডার তৈরিতে লিপ্ত থাকা 'ওয়ার রুমের' সঙ্গে কাজ করছেন। এঁরা একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে খবরাখবর সংগ্রহ করছেন। মাপছেন মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভের আন্দাজ। এঁদের এক ছাতার তলায় নিয়ে সংহত করছেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস আধিকারিক কে কৈলাশনাথন, যিনি এখন মোদীর মুখ্য পার্সোনাল সেক্রেটারির ভূমিকায়। জনসমুদ্রের আকার নেওয়া জনসভাগুলিতে দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষজনকে নেহাত বক্তৃতার চমকে আটকে রাখায় মোদী বিশ্বাসী নন। তাঁর চাই নিরেট তথ্য। সেই রাজ্যটির বিশেষত্ব, তার কৃতী মানুষদের তালিকা ও অবদান। এ সবই তাঁর ভাষণকে ক্ষুরধার করে তুলছে। আবেগাপ্লুত করছে শ্রোতাদের।

এসব সরবরাহের পরিকল্পনা করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। সেবারের সঙ্গে গুণগত তফাত— এবার নেতা, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, পেশাদার দলের সকল অংশই মসৃণভাবে একে অপরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন। ঠিক যেমন একটি সফল চলচ্চিত্র তৈরি করতে কাহিনীকার, ক্যামেরাম্যান, সম্পাদক, আবহসঙ্গীতকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ লেখক সকলের যৌথ চেষ্টাকে নিয়ে কুশলী পরিচালক ছবিকে নিশ্চিত সাফল্যের রাস্তায় নিয়ে যান। মোদী সেই কাজটাই করছেন। আজকের প্রতিটি সভায় তিনি প্রায় নিখুঁত। তাঁর নেপথ্য নায়ক যাঁরা তাঁদের কাজকর্ম কেমন ভাবে হয় দেখা যাক।

নেপথ্যবাহিনী

অসম্ভব কৌতুহল উদ্রেককারী মোদীর ভাষণগুলি গালগল্প নয়। তাঁর ব্যক্তিগত বাহিনীতে রয়েছেন প্রায় ২৪ জনের এক ঈর্ষণীয় গবেষক বাহিনী। এঁদের অনেকেই ইঞ্জিনিয়ার, বিদ্বজ্জন, আই আই এম কিংবা এন আই ডি-র স্নাতক। যে সব জায়গায় মোদী বক্তব্য রাখবেন এঁরা সেখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য আগে ভাগেই সংগ্রহ করে সেগুলি বাজিয়ে নেন। মোদীর এক সভা থেকে আর এক সভার আকাশ-যাত্রার আগে তাঁর হাতে পরিমার্জিত ভাবে তা তুলে দেন। তাঁর নিজস্ব ১৩ সিটের প্রচার-বিমানে তথ্য ঝাড়াই বাছাই করার জন্য যেমন থাকেন তাঁর ৬৯ বছর বয়সী পাবলিক রিলেশন অফিসার জগদীশ ঠাকুর, আবার ব্যক্তিগত সহকারী ৩৩ বছরের ওমপ্রকাশ চ্যান্ডেল-এর মতো যুবা। তথ্যের মূল সূত্রগুলি যাকে বলে গুজরাটি ভাষায় 'বুলেট পয়েন্ট' হিসেবে তাঁর হাতে দেওয়া হয়। গুয়াহাটির দেড় লক্ষ লোকের

কোর কমিটি

অমিত শাহ (৫১)

গুজরাট সরকারের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি মোদীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নির্বাচনের কি কি পরিকল্পনা বা কৌশল হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তিনি মোদীকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। গত এক দশক ধরে তিনি এই কাজ করে চলেছেন।

কে কৈলাশনাথন (৬০)

৬০ বছরের কে কৈলাশনাথন গুজরাটের মোদী সরকারের মুখ্যসচিব। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনিই মোদীর সমস্ত রাজনৈতিক এবং জনসংযোগকারী হিসাবে কাজ করেন। পাশাপাশি তিনি প্রশাসনিক দিকটাও দেখেন। মোদী টীমের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির কাজকর্মগুলির প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখেন।

প্রচার অভিযানের পরিচালক

অরবিন্দ গুপ্তা

৪৩ বছর বয়সী নিউ দিল্লীর অরবিন্দ গুপ্তা তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রধান। মূলত তাঁর নেতৃত্বে একটি দল মোদীর সোস্যাল মিডিয়ায় প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে দলে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষের (১ মিলিয়ন) কাছাকাছি।

মহাসমাবেশে মনমোহন সিং দু' দুবার অসমের সাংসদ হয়ে যখন অসমের উন্নয়ন করতে পারলেন না তখন তাঁর কাছে কি করে সারা ভারতের উন্নয়ন আশা করা যায়। এমন একটি নিরেট তথ্য তাঁর ক্ষুরধার ভঙ্গীমায় পরিবেশিত হয়ে শ্রোতাকে মোহিত করে দিয়েছিল। কিংবা প্রয়াত দেশপ্রেমী গোপীনাথ বরদলৈকে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের ভারতরত্ন প্রদানের মতো চমকপ্রদ তথ্য যা স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও কংগ্রেস সরকার বিবেচনার যোগ্য মনে করেনি। ভাষণের অবসরে তিনি মনে করিয়ে দেন সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে বরদলৈ কিভাবে অসমের পাকিস্তান যাওয়া ঠেকিয়ে ছিলেন। বাংলায় এসে কেন্দ্রে তাঁকে নির্বাচিত করার ডাক দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের ভোটে স্থিতাবস্থা রাখার আবেদন জানানোর কূটকৌশলের ফাঁকে তিনি রবীন্দ্রনাথের কোন ভ্রাতা আমেদাবাদে কটন মিল প্রতিষ্ঠার কাজে হাত লাগিয়ে ছিলেন ইতিহাস অবহেলিত এমন সব তথ্যরাজি শ্রোতাদের উপহার দেন। এগুলি সবই গবেষণালব্ধ। এর মধ্যেও কখনও কখনও তথ্য বিভ্রাট হয়তো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের আন্তরিক সমর্থনে সেগুলি গ্রাহ্য হচ্ছে না। গত সপ্তাহের লক্ষ্ণৌ-এর তাবৎ পরিসংখ্যান ভঙ্গকারী 'বিজয় শঙ্খনাদ' র‍্যালী তার হতেনাতে প্রমাণ। মুলায়ম সিং প্রকারান্তরে এটি মেনে নিতে বাধ্য হন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ্ণৌমুখী ২৯টি ট্রেনে বিরাট সংখ্যক আসন আগেই সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। প্রত্যেকটি বুথ ম্যানেজারদের দায়িত্ব ছিল অন্তত ১০০ জন শ্রোতাকে সভাস্থলে নিয়ে যাওয়ার। সভা সাফল্যের শীর্ষসীমা স্পর্শ করেছে। অন্য রাজ্যের মানুষ টিভিতে তা দেখেছেন। যেখানে ইতিহাসের ধূসর পৃষ্ঠা ফিরে দেখার দরকার সেখানে তিনি অতীতচারী। ২৫.১০.১৩-র উত্তরপ্রদেশের সভায় তাঁর অঙ্গীকার শ্রোতাদের মধ্যে

যুদ্ধের দু'টি কেন্দ্র

গান্ধীনগর এবং আমেদাবাদ— এই দুই শহর তাঁর কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র। তাঁর নেতৃত্বে এই দুই শহরে দু'টি দল কাজ করে চলেছে।

আই আই টি, আই আই এম এবং দেশের বিভিন্ন নামী প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা এই দুই দলে রয়েছেন। বিভিন্ন জায়গার স্থানীয় বিষয়গুলির সম্বন্ধে মোদীকে তারা জানায় এবং বিভিন্ন এলাকার লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তিনি কি বলবেন সেই বিষয়ে অবহিত করেন।

নীতি এবং পরিকল্পনা গোষ্ঠী

প্রশান্ত কিশোর

গান্ধীনগরের ৩৫ বছর বয়সী প্রশান্ত কিশোর রাষ্ট্রসঙ্ঘের একজন প্রাক্তন পরিকল্পনাকার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। মূলত মোদীর সমর্থক হিসাবে তিনি 'সিটিজেন ফর অ্যাকাউন্টেবল গভর্নেনস' নামে একটি সংস্থা গঠন করেছেন। এছাড়াও তিনি মোদীর একজন পরামর্শকারী এবং কৌশলী হিসাবে কাজ করছেন।

সোস্যাল মিডিয়া গোষ্ঠী

হীরেন যোশী

বছর ৪৩-এর গান্ধীনগরের হীরেন যোশী একজন আর এস এস কার্যকর্তার পুত্র। তিনি মূলত রাজস্থানের বাসিন্দা। গুজরাট মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের একজন তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ। হীরেন যোশী 'ইন্ডিয়া ২৭২⁺ (India 272⁺)' সোস্যাল মিডিয়া পেজটি চালান, সেই সঙ্গে মোদীর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটিও তিনি তত্ত্বাবধান করেন।

ব্যক্তিগত সহায়ক দল

গান্ধীনগরের সঞ্জয় ভাস্কর (৪৯), জগদীশ থ্যাকার (৬৯), আপ্ত সহায়ক তন্ময় মেহতা (৪২), ওমপ্রকাশ সিং চাণ্ডেল (৩৩) এবং দীনেশ বিস্ত (৩৪)-রা সামগ্রিকভাবে মোদীর কাজের ধারা সামলান। এরা মোদীর সভাসমাবেশ থেকে সাক্ষাতের সময় সব কিছুই দেখভাল করেন। সেই সঙ্গে প্রচারমাধ্যম ও বিভিন্নজনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা ও অন্যান্য গোষ্ঠী এবং নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় রাখার কাজ করেন।

পরামর্শদাতা

পীযূষ গোয়েল (৫৫)

মুম্বইয়ের বিজেপি কর্মী পীযূষ মোদী-ঘনিষ্ঠ এবং সেই সঙ্গে নীতি-নির্ধারণ থেকে সোস্যাল মিডিয়ার মতো বিভিন্ন বিষয়ে মোদীর কি কি কৌশল হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তিনি সাহায্য করে থাকেন।

রাজেশ জৈন

৫৩ বছর বয়সী রাজেশ জৈন মুম্বাইয়ের বাসিন্দা। একজন সাহসী দক্ষ সংগঠক হিসাবে তিনি ইন্ডিয়া ইনডিয়াইনফোলিন (Indiainfoline) এবং নিটিসেন্ট্রাল (Niticentral) তৈরি করেন। সেই সঙ্গে লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে সারা দেশের ভোটদাতাদের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করে চলেছেন তিনি।

বিকাশ সংকীর্তায়ন

নিউ দিল্লীর বছর ৩২-এর বিকাশ মোদীর সোস্যাল মিডিয়া গোষ্ঠীর প্রধান। মূলত তিনিই 'আই সার্পোট নমো' ('I Support Namo') সাইটটির মতো স্বাধীনভাবে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের পরিচালনা করেন।

সম্মোহন সৃষ্টি করেছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পিঠে ঢাল বেঁধে রাখা রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রতিজ্ঞা উদ্ধৃত করলেন ''মেরী ঝাঁসী নেহী দুঙ্গি''। এর পর জনতাকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চারিত হলো বজ্রনাদ— ''বেইমানোকো দেশ নেহী দেঙ্গে''। এই নিবিড় পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত থাকা এক প্রবীণ বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, সর্বার্থেই এবারের প্রচার 'Pan Indian modern election campaign'. কেননা এবার নিশ্চিত করে নেওয়া হয়েছে, আমরা ঠিক কোন নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে যেতে চাই আর সেই গন্তব্যের সঠিক পন্থা কি?

ভবিষ্যতের নিশ্চিত দিশা

কোনো ভাসা ভাসা পেঁয়াজ-ঘরানার বাণী রেখে যাওয়া নয় যা ছাড়াতে ছাড়াতে অন্তে কিছুই মিলবে না। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে খাপ খায়, বাস্তবে পূরণ করা সম্ভব এমনই প্রতিশ্রুতি তিনি হত- দরিদ্র মানুষজনের কাছে রাখছেন। যেমন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেশের শিল্পপতি, অর্থনীতিবিদ, সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে আদবানীজী, জেটলিজী, শ্রীমতী স্বরাজ ও শ্রী যশবন্ত সিনহার মতো প্রবীণ নেতাদের মতামত নিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ অর্থ- নীতির রূপরেখার নকসা তৈরি করেন। এই প্রক্রিয়ায় ৪২ হাজার অভিমত জমা পড়েছিল। এসব হেলিকপ্টার অবতরণের পর পারিবারিক মনোবাঞ্ছা পূরণের ছটফটানি নয়। গভীর পরিশ্রমসাপেক্ষ এক পথ পরিক্রমা। অগ্রাধিকারভিত্তিক ভাবনাগুলি এরকম—

(১) দেশকে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও কম বৃদ্ধির চক্র থেকে উত্তরণ ঘটানো।

(২) যুবশক্তির জন্য চাকরি তৈরি করার ক্ষেত্রে দেশে লগ্নীর মাত্রায় ব্যাপক বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করা। শুধু পরিকল্পনা কমিশনের মতো তাঁবাদী হয়ে যাওয়া পদ্ধতির অনুকরণ আদৌ নয়। ''অ্যাক্ট নেহী অ্যাকশন চাহিয়ে।''

(৩) আজকের শহরগুলি জনসংখ্যার চাপে বিস্ফোরক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। তিনি দেশের মধ্যে অন্তত ১০০টি সর্বাধুনিক শহর তৈরির পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। তাঁর কথায় চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড পারলে আমরা পারবো না কেন? ''কমিটি নেহী কমিটমেন্ট চাহিয়ে।''

(৪) ন্যূনতম সরকারি নাকগলানোর মাধ্যমে স্বাধীন জনমুখী শিল্পের বিকাশ তাঁর অগ্রাধিকার।

(৫) খুচরো ব্যবসায় এফ ডি আই (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)- এর অনুপ্রবেশ তাঁর মনঃপুত নয়। এতে ছোট ব্যবসায়ী বিপদে পড়তে পারে।

(৬) তাঁর নানান ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা তথ্য দিয়ে

দেখেছেন চীন ও ব্রাজিলের তুলনায় অমেদের ডিজিপি-র সঙ্গে কর আদায়ের অনুপাত (আমাদের ১৫ শতাংশ তাদের ৩০ শতাংশ)। এ বিষয়ে দল পুনের 'অর্থক্রান্তি' নামে একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার সঙ্গে গভীর আলোচনা চালাচ্ছে।

(৭) দেশের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ শস্য, দানা, সবজি প্রভৃতি আলাদা ধরে বিগত বছরের ভোগ সূচকের সঙ্গে মিলিয়ে আগাম আমদানি রপ্তানির পরিকল্পনা নেওয়া।

(৮) তিনি ৫টি T-এর ওপর জোর দিচ্ছেন--- ট্রাডিশন, ট্যালেন্ট, ট্রেড, ট্যুরিজিম, টেকনোলজি।

(৯) সর্বাধিক গুরুত্বের আসনে রয়েছে দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, দক্ষ প্রশাসন। তিনি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন ২০১৩ সালে দেশ দীর্ঘসূত্রী, দুর্নীতি, নীতি-পঙ্গুতার কারণে ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হারিয়েছে। এর পুনরাবৃত্তি তিনি হতে দেবেন না। তাই তিনি সুযোগ্য প্রার্থী। তিনি ৬০ বছর নয়, ৬০ মাস চাইছেন।

আগামী এপ্রিলে এই রুগ্ন হাঁপিয়ে পড়া দেশটির বীতশ্রদ্ধ নাগরিকদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁরা কি আবার সেই কংগ্রেস বা বিভিন্ন রাজ্যে ছড়ানো তাদেরই ছদ্মঅনুগামী তৃতীয় চতুর্থ বা বিচিত্র নামধারী সুযোগ সন্ধানী দলগুলিকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেশকে ক্রম বিকলাঙ্গতার পথে এগিয়ে দিতে চান? অন্য প্রান্তে রয়েছেন দৃঢ় সংকল্প, নিজরাজ্যে বারবার সাফল্য প্রমাণ করা এক নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক প্রশাসক। এবার দান আপনার।

(তথ্যসূত্র : ইন্ডিয়া টু ডে)

Sharada Travels

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া   প্রত্যুষ মন্ডল — **9874398337**

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ সূচী ২০১৪

ভ্রমণ	মূখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
কাশ্মীর	জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী	১৩	১৭ই মে	১৪,৫০০/-
দার্জিলিং	টাইগার হিল, ঘুম মনেস্ট্রী, বাতাসী, মিরিক	৬	৩০শে মে	৬,০০০/-
সিমলা	সিমলা, কুফরি, মানালী, রোটাংপাস, কুলু, মনিকরন	১১	১৮ই মে	১১,২০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার-হৃষিকেশ, লক্ষ্মনঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী	৮	২৭শে মে	৬,২০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর তিন মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস), বড়/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ,ডিনার (আমিষ/নিরামিষ),টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া,ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে,হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

✷ ভ্রমণ শুরু ও শেষ, হাওড়া/শিয়ালদহ/ কোলকাতা অথবা উল্লেখ্য নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে ✷ হঠাৎ করে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি অথবা ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্যাকেজ মূল্য বর্ধিত হবে। ✷ বালক / বালিকাদের ক্ষেত্রে (৫-১১ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ৭৫% টাকা লাগবে। শিশুদের ক্ষেত্রে (২-৪ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ২৫% টাকা লাগবে।

আমি কেন তখতে মোদীকে চাই?

এটা এমন একটা প্রশ্ন, যার জবাব দিতে গিয়ে আমার মতন প্রথমাবধি রাজনীতিবহির্ভূত কলমচিও আর নিজেকে গুটিয়ে না রেখে সরাসরি কবুল করছে, আমার সমর্থন আমারই বিবেকের সঙ্গোপন নির্দেশে। নিজের জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে দ্বিধাহীনভাবে জানাই, ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী রূপে আমি নরেন্দ্র মোদীকেই দেখতে চাই।

— **শেখর সেনগুপ্ত**

প্রথম কারণ যদি বিবেকের নির্দেশ হয়, দ্বিতীয় হেতু হলো, আমি যে একজন বাঙালি— যে বাঙালির আজ অবশ্য কর্তব্য, নিজ নিজ সুখাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অন্তত একবার ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা। নিশ্চুপ নিঃশব্দ ইতিহাসকে মুখর করে তোলার এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ।

বিবেকের দংশন এইজন্য যে এক সময় অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রতি আমরা অনেকেই সমবেতভাবে অবিচার করেছি। আমরা তাঁর সাফল্যের গভীরতাকে পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়েছি; রাজনীতির পিচ্ছিল ক্রীড়ায় আমরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছি। দেশ স্বাধীন হবার পর আজ অবধি যতজন প্রধানমন্ত্রীকে আমরা পেয়েছি, অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁদের মধ্যে অনন্য। আবেগকে সরিয়ে যুক্তিকে নিবিষ্ট করতে পারলে এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত মনে হবে। অটলবিহারী চুপিসারে রক্তে ভেজা Midnight Freedom-এর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেননি। তিনি সাধারণ গণতান্ত্রিক সৌজন্যের বাইরে দাঁড়িয়ে পরিবারতন্ত্রের ঢাক বাজাননি। নিজের বাদশাহি অক্ষুণ্ণ রাখতে এমারজেন্সির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শ্মশানমুখী করেননি। বিদেশনীতির নির্ণয়ে ও প্রয়োগে বাজপেয়ী আজ যথার্থ কিংবদন্তী। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা কাকে বলা উচিত, বাজপেয়ী তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, সর্বোপরি দেশের সার্বিক উন্নয়নে সততার সঙ্গে কীভাবে অগ্রগামী হওয়া যায়, কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি নামক দানবকে কাবু করে দেশের তাবৎ নাগরিকদের স্বস্তিদায়ক আবহে রাখা সম্ভব— এ সকল একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই শিক্ষণীয়। তাই ভোটযুদ্ধে বাজপেয়ীর পরাজয় আজ আমার কাছে কেবল একটি মনখারাপ করা ঘটনা নয়, অত্যন্ত মর্মান্তিক প্রমাদ— যার প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার সমর্থন নরেন্দ্র মোদীকে। ঋজু ব্যক্তিত্ব নরেন্দ্র মোদীর পিছনে আমি বিলক্ষণ অটলবিহারী বাজপেয়ীর ছায়া দেখতে পাই, যদিও আমার এমত বিশ্লেষণ দু'-একজন বান্ধবের মন খারাপের কারণ হতেই পারে। তাঁদের ডিসার্টেশন, ইনভেস্টিচার ভিন্নতর হলে আমি নাচার। আমি দেখেছি, নরেন্দ্রমোদী অটলজীর মতন সোজাসাপটা কথা বলার মানুষ, উন্নয়নের অগ্রদূত এবং 'সেকুলারিজম্' সম্পর্কে তাঁর অভিমত যুগপৎ স্বচ্ছ ও প্রণিধানযোগ্য।

মজফ্ফরনগরের এক জনসভায় মোদীর সঙ্গে রামবিলাস পাশোয়ান।

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে আমি যা বুঝি, তা হলো এই যে, রাষ্ট্রের চোখে সকল ধর্মের মানুষ সমতালাভের হকদার। একই সিভিল ল তাদের ওপর যেন কার্যকরী হয়। ধর্মকে খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে

কোনও কোনও সম্প্রদায়ের হৃদয়চুরির চেষ্টা আমরা বহুকাল যাবৎ দেখে আসছি। ভোট যত এগিয়ে আসে সংখ্যালঘুদের তথাকথিত 'বাড়তি সুবিধা' দানের প্রতিশ্রুতি খইয়ের মতন ফুটতে থাকে। এই বিদ্যায় উচ্চলম্ফন দেবার অভ্যেস যাঁদের, তাঁরা কিন্তু আদতে সংখ্যালঘুদের অন্ধকারে রেখে দিতে পারলেই খুশি হন।

নরেন্দ্র মোদীর বিশ্লেষণে নাগরিকরা দুই শ্রেণীর— সচ্ছল ও অসচ্ছল। অসচ্ছলদের সচ্ছলতার দিকে নিয়ে যাবার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সার্থকতা। এখানে ধর্মাধর্মের পরিচিতি নিতান্ত গৌণ। এই বিচারের নিরিখে গুজরাতের সংখ্যালঘুরা আজ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক সম্পন্ন ও পরিশীলিত।

আগে বলেছি, নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থনের অন্যতম কারণ, আমি বাঙালি। পর্দা সরালে নরেন্দ্র মোদীর পিছনে আমি যেমন বাজপেয়ীর ছায়া দেখতে পাই, তেমনি সেই উষ্ণ স্কাইলাইন জুড়ে স্পষ্ট আর এক মহৎ প্রাণের অবয়ব। তিনি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যখন এই অধম কলকাতার কসবা এলাকার চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় তামাম কলকাতা একদিন বেদনায়, ক্রোধে, বিমূঢ়তায় কম্পমান হয়েছিল, অনেকে অকাতরে আত্মবিসর্জন দিতে চেয়েছিল, যখন বাঙালির চোখের মণি, বিজেপি-র আদি প্রাণপুরুষ ডঃ শ্যামাপ্রসাদের নিস্পন্দ দেহ এসে পৌঁছোল শ্রীনগর থেকে কলকাতায়। নেহেরু-শেখ আব্দুল্লাকে ধিক্কার জানিয়ে সেদিন বাঙালি যে পরিমাণ চিৎকার করেছিল, শপথ নিয়েছিল, তা যেভাবে ক্রমে বায়বীয় হয়ে গেল, আজ ভাবলে লজ্জা হয়। আজ সেই বিস্মৃতির মূল্য চুকিয়ে দিতে হবে বাঙালিকে। নরেন্দ্র মোদী দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ইতিহাসের নগণ্য ছাত্র আমি। তবুও যখন নিদান বা নিধানের সন্ধানী হই, বিগত দিনগুলিই আমাকে পথ চেনায়। আজ আমরা তো প্রায় ভুলেই গিয়েছি যে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭— সেই ক্রান্তিকালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য প্রণবানন্দজী মহারাজের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে বৃহৎ প্রতিরোধ গড়ে না তুললে বাঙালি জাতির ভবিতব্য আরও কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারত। গান্ধীজী তখন ক্রমে ক্রমে অপ্রাসঙ্গিক এবং লেডি মাউন্টব্যাটনের সম্মোহনে আচ্ছন্ন অপর কান্ডারি। ওই সময়ে প্রণবানন্দজী ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ যদি রুখে না দাঁড়াতেন আজ কোথায় থাকত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং এই গর্বের 'সিটি অফ জয়'? ইতিহাসের পাতা ওল্টালে সব জানতে পারবেন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন, আপনার রায় কী হওয়া উচিত। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত স্বামী বেদানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রী যুগাচার্য জীবন চরিত' গ্রন্থ থেকে একটি ক্ষুদ্রাংশকে তুলে ধরছি ওই দুই কালপুরুষের তৎকালীন ভূমিকাকে ব্যক্ত করতে :

"আগস্ট মাসে শ্রীশ্রী আচার্যদেব এক বিরাট হিন্দু মহাসম্মেলনের আয়োজন করিলেন। সভাপতিত্বে রহিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্যার এস. এন. মুখার্জি, (ডাঃ) স্যার নীলরতন সরকার, (ডাঃ) স্যার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী, মিঃ সি. চ্যাটার্জি, শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ এস এন ব্যানার্জি, শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কুমার শ্রী প্রমথনাথ রায়, শ্রী যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রী সনৎকুমার রায়চৌধুরী, শ্রী নিশীথরঞ্জন সেন প্রমুখ নেতারা। শ্যামাপ্রসাদ সমেত সকলে আচার্যদেবের সহিত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করিলেন— বাঙলার দুর্গত হিন্দুর আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে বাঙলার গ্রামে গ্রামে যে রক্ষিদল গঠন কার্য চলিতেছে, তাহাই যে একমাত্র পথ, স্বীকার করিতে হইবে।..." (অষ্টম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৯৮)।

বাঙালি সেদিন শ্যামাপ্রসাদকে আশ্রয় করে নিজেদের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত হতে দেয়নি। নরেন্দ্র মোদীর হাতে সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পতাকা। বিস্মৃতির অজুহাতে আর পাপ করতে চাই না। সবশেষে বলি, নরেন্দ্র মোদীর সংগ্রামী জীবন আমার নিজের অতীতকে মনে করিয়ে দেয়। দরিদ্র বালক নরেন্দ্র রেলস্টেশনে ভাঁড়ে করে চা বিক্রি করছে। আমি দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাই না। টিউশানি করে মার হাতে কয়েকটা টাকা তুলে দিই। গৈলা সম্মেলনীর বৃত্তিতে বই-খাতা ক্রয় করি, সরকারি জলপানির টাকায় জামা-কুর্তা, আর ইতিউতি লিখে প্রথম যৌবনে যা হাতে আসে, তাতেই উদ্দীপ্ত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চেষ্টা করি।

(লেখক বিশিষ্ট বাংলা সাহিত্যিক)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

পড়ুন ও পড়ান

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন।

ভোজকর্তা

নবকুমার ভট্টাচার্য

রামপদ পাহাড়ীকে অনেকেই চেনে না। আজকের দিনে রামপদ পাহাড়ীকে না চেনারই কথা, কারণ এই মানুষটিকে আজ আর প্রয়োজন নেই। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন রামনগর ছাড়াও আশেপাশের আট দশটা গ্রামে তাঁর জরুরি ডাক পড়ত। দেপাল, চিরুলিয়া, মন্দার, দেউলিহাট, এগরা, মির্জাপুর, চোরপালিয়া-সহ পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় সর্বত্রই তাঁর খোঁজ পড়ত। বাড়িতে বিয়ে লাগলেই রামপদকে চাই। বিশেষ করে মেয়ের বিয়ে হলে তাঁকে ছাড়া চলবে না। খঞ্জির অমূল্য সামন্ত কিংবা কেলোমালের দাশরথি জানারাও আজ রামপদ পাহাড়ীর মতো ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছেন। এককালে তাঁদের রমরমা বাজার থাকলেও বর্তমানে তাঁরা ব্রাত্য। সেকালের অনুষ্ঠানবাড়ির গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিলেন তাঁরা। তাঁদের বলা হোত ভোজকর্তা। এই নামটির সঙ্গে আজকের প্রজন্ম খুব একটা পরিচিত নয়। গত শতকের প্রথম দশকে যখন 'মেনুকার্ড' নামক বস্তুটির কথা ভাবাই হয়নি তখন প্রায় সকল মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত বাড়ির পঙ্‌ক্তি ভোজনে ভোজকর্তা অপরিহার্য ছিল। এক কথায় সেকালে মেনুকার্ডের অভাব পূরণ করতেন 'ভোজকর্তা'। তাঁদের কাজ ছিল যখন যে আইটেম ঢুকছে তা উচ্চগ্রামে জানান দেওয়া। যদি শাকভাজা থেকে পায়েস সেদিনের খাওয়ার তালিকায় থাকে, তা হলে সেটি ভোজ আসরে আসার প্রাক্-মুহূর্তে ভোজকর্তা হাঁকডাক করে তা জানিয়ে দেবেন— 'আপনারা তৈরি হোন। এবার আসছে পায়েস'। কখনও কখনও অ্যালার্ট করে দিতেন পরের পদটি সম্বন্ধেও।

একশ বছর পূর্বে অনুষ্ঠান বাড়ির খাদ্য তালিকার সঙ্গে আজকের ফারাক আকাশ পাতাল। তখন অনুষ্ঠানবাড়ির খাদ্য তালিকায় অন্নের সঙ্গে শাক অবশ্যই থাকত। বলা হোত 'শাকান্নের নিমন্ত্রণ'। কন্যার বিবাহের পরদিন দুপুরে বরযাত্রীদের পেটপুরে ভোজনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন কন্যাপিতা। এই অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'সুকৃতি ভোজন'। বরযাত্রীরা অনেক সময়েই পাত্রীপক্ষকে অপদস্থ করার জন্য যথেচ্ছ ভোজন করতেন, অথবা নষ্টও করতেন বহু খাবার। এই অনুষ্ঠানগুলিতে ভোজকর্তাই সার্বিকভাবে খাওয়া-দাওয়ার বিষয়টি দেখভাল করতেন। বিয়ের দিনও অতিথি অভ্যাগতদের স্বাগত জানাতেন এবং খাওয়া-দাওয়া দেখভাল করতেন ভোজকর্তারাই। 'ভাল করে খান', 'একদম লজ্জা করবেন না', 'আপনি তো কিছুই নিলেন না,' 'অমুক রান্নাটা কেমন হয়েছে?' 'আর কি লাগবে?' 'আরেকটু মাংস' বা 'খান কয়েক মণ্ডা'— এসব বলতেন আর বলার মাধ্যমেই ভোজসভাকে আরও রঙদার ও উদ্দীপ্ত করে তুলতেন। এক কথায় ভোজকর্তা ছিলেন সেকালের মেনুকার্ডের ধ্বনি-সংস্করণ। গোঁড়া হিন্দু পরিবারের নিমন্ত্রণ পর্বের ভোজনে অতিথিদের ভোজনমন্ত্র পাঠ করাতেন ভোজকর্তা। পঙ্‌ক্তিতে বসা অতিথিরা সমবেত ভাবে সেই মন্ত্র পাঠও করত। নতুন উপবীতধারি ব্রাহ্মণ বালককে ভোজনে গণ্ডুষ করিয়েও দিতেন তিনি। অর্থাৎ ভোজকর্তা ভোজনপর্ব পরিচালনা করতেন, সঙ্গে অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়নও করতেন।

বাজখাঁই গলা বা উচ্চৈঃস্বর না থাকলে এ পেশায় সাফল্য নেই। এছাড়াও রান্না এবং কথাবার্তায় চৌকশ হওয়া চাই।

সম্পূর্ণভাবে উঠে না গেলেও এখন এই প্রথা বিরলদৃষ্ট। ক্যাটারিং প্রথা এবং মেনুকার্ডের আবির্ভাবে ভোজকর্তারা অকিঞ্চিৎকর হয়ে গিয়েছেন। যদিও মেনুকার্ডের নীরবতায় পদ পরিবেশনের গোটা প্রক্রিয়াটি আজ হয়ে উঠেছে ভীষণ নৈর্ব্যক্তিক, ইমপারসোনাল। পঙ্‌ক্তি মণ্ডপে একের পর এক খাবার ঢুকছে আর একজন চেঁচিয়ে সেইসব জাহির করছে, সঙ্গে সঙ্গে পাকযন্ত্রে ক্ষরিত হচ্ছে হজমসহায়ক উৎসেচক— এর মধ্যে যে টানটান কৌতূহল উত্তেজনা ছিল, আজ মেনুকার্ডের নীরব উপস্থিতি সেই শিহরণের মৃত্যু ঘটিয়েছে।

বাড়িতে ভিয়েন বসা থেকে শুরু করে অষ্টমঙ্গলা পর্যন্ত ভোজকর্তা বিয়েবাড়ির পরিচালক বনে যেতেন। এখনও খুঁজলে অজগাঁয়ে এইরকম দু'একজন ব্যক্তিকে পাওয়া যেতে পারে। তবে গ্রামেও আর গ্রাম নেই।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

পরম্পরা

ভারতীয় সংস্কৃতির মহান সাক্ষী— মথুরা-বৃন্দাবন

রবীন সেনগুপ্ত

মথুরার প্রাচীন নাম শূরসেন রাজ্য। এখানে এক সময় মধু দৈত্য রাজত্ব করত। মধু দৈত্যের নাম থেকেই মথুরা নামটি এসেছে। মধুর পুত্র লবণ ছাড়াও বিখ্যাত অসুর রাজা কংস এই অঞ্চলে রাজত্ব করে গেছেন। পৃথিবীতে যেমন দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ পালা করে আসে তেমনই ভারতবর্ষ মূলত দেবভূমি হলেও এদেশেও দেবতা ও অসুরদের শাসন বরাবরই

শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান মন্দির।

পালা করে এসেছে। কংসকে হত্যা করে দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে উগ্রসেন ও পরে নিজেই মথুরায় সিংহাসনে বসেন—সে কথা অনেকেই জানেন।

মথুরা বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা। জেলাটির সদর শহরেরও নাম মথুরা। মথুরা থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে বৃন্দাবন একটি ছোট শহর। বৈষ্ণবধর্ম ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে এম.এ, ডক্টরেট অবধি পড়ার জন্য সেখানে রয়েছে বৃন্দাবন ইউনিভারসিটি। এ জেলার শিক্ষার মানচিত্রে শ্রীচৈতন্য ইন্টার কলেজেরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মথুরা মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠা করে বৃটিশ সরকার।

গজনীর সুলতান মামুদ ১০১৮ খৃস্টাব্দে, সেকেন্দার লোদী (১৪৮৮-১৫১৭) ও আহমদ শাহ আবদালী ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে সমৃদ্ধ মথুরা নগরী আক্রমণ করে লুট, হত্যা ও ধর্ষণ চালায়। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি তারা এদেশ থেকে নিয়ে বিদেশে চলে যায়। মথুরার রাজারা দুর্ভাগ্যবশত বারবার অসামান্য লড়াই করেও অল্পের জন্য পরাজিত হন। পরে অবশ্য হার না মানা হিন্দু সন্তানরা আবার মথুরামণ্ডলকে সমৃদ্ধ করে তোলে। বেশ কিছু মসজিদে রূপান্তরিত মন্দিরকে পুনরুদ্ধার করে। মন্দির সংখ্যার দিক দিয়ে হিন্দুরা আবার মথুরার ব্রজমণ্ডলকে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রূপে গড়ে তোলে। বিধর্মী লোকজন অনেকেই এখানে বসবাস করে বৈষ্ণবধর্ম চর্চা ও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কবি রসখান-এর মতো এলাকার বিখ্যাত ব্যক্তিও শেষ জীবনে ইসলাম ছেড়ে বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী হয়ে পড়েন।

মথুরা মণ্ডলে রয়েছে ১২টি বন, ১২টি উপবন, ১২টি প্রতিবন, ১২টি আদি বন, ১২টি তপোবন, ১২টি মোক্ষবন, ১২টি কামবন, ১২টি অর্থবন, ১২টি ধর্মবন ও ১২টি সিদ্ধবন। ব্রজ মণ্ডলের চুরাশি ক্রোশ বা শ'তিনেক কিলোমিটারের মধ্যে ও সমগ্র জেলায় প্রায় ৫ হাজারটি মন্দির রয়েছে। সবচেয়ে বিখ্যাত হলো দ্বাদশ বন। এই ১২টি বন হলো— বৃন্দাবন, মধুবন, লৌহবন, ভদ্রবন, কাম্যবন, কুমুদ বন, তালবন, খদির বন, মহাবন, বহুলা বন, বিল্বন ও ভাণ্ডীর বন। অনেকেই পায়ে হেঁটে দল বেঁধে এক মাস দেড় মাস ধরে এই ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করে ভক্তিরসের আনন্দ আস্বাদন করেন। আবার বাস যোগেও একজেলায় মধ্যে ১২টি বন দর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। মথুরা হলো বৈষ্ণবধর্মের রাজধানী। হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবদের সংখ্যাই সর্বাধিক। ব্রজমণ্ডল তাঁদের সকলেরই কাছে প্রাণস্বরূপ। মথুরা থেকে দিল্লী প্রায় দেড়শ কিলোমিটার, ঘণ্টা তিনেকের বেশি সময় লাগে রেল ও সড়ক পথে। জাঠ রাজা সুরজমল ১৭৬৩ খৃস্টাব্দ অবধি এই এলাকায় শাসন চালিয়েছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু এলাকায় বহু নষ্ট হয়ে যাওয়া স্থান পুনরুদ্ধার করেন। পরে মহাপ্রভুর নির্দেশে রূপ ও সনাতনও এলাকাটির সংস্কারে ব্যাপক অবদান রাখেন।

এলাকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি হলো রঙ্গনাথজীর মন্দির, বাঁকেবিহারী মন্দির, ষড় গোস্বামী মন্দির, রাধা মায়ের জন্মস্থান রাভেলগাঁও ও লীলাস্থল বর্ষনা, যমুনা নদী, কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান, বেশিরভাগ যা এখনো মসজিদ রূপান্তরিত, কেশী ঘাট, মান সরোবর। বাংলার বিখ্যাত বৈষ্ণব গুরু প্রভু জগদ্বন্ধুর আশ্রম, কৃপালু মহারাজের বিশাল চমকপ্রদ মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ইস্কনের মন্দির, রমনরেতি, গৌড় কিশোর গোস্বামীর মতো ভারত বিখ্যাত রাধা-সংগীত গায়কের আশ্রম— এগুলিও ব্রজমণ্ডলের উল্লেখযোগ্য স্থান। দোল উৎসব, জন্মাষ্টমীতে এলাকায় পর্যটক উপচে পড়ে। যাঁরা রাধাকৃষ্ণকে বাস্তব ও ঐতিহাসিক বলে মানতে চান না তাঁদের অনেকেই ব্রজমণ্ডল ভ্রমণ করে প্রচুর প্রমাণ ও অনুভূতি লাভ করে মতামত বদলাতে বাধ্য হন।

প্রাণায়াম সতর্কবার্তা

(ক) ‘‘শাস্ত্রেবলে আত্মসমাহিত হওয়ার জন্য সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে এই সত্যে পৌঁছিয়াছেন তিনিই যোগী।... যোগী তখন নিজের যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ ভাগবত সত্তা উপলব্ধি করেন।

...যদি কেহ এই সত্য লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে শুধু বক্তৃতা শুনিলেই বা কিছুটা প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই চলিবে না, প্রস্তুতির উপরেই সব কিছু নির্ভর করে। ...দিনের প্রধান ভোজনটি করিতে আর কতটুকু সময় লাগে? বোধহয় আধঘণ্টার বেশি দরকার হয় না। কিন্তু খাবারগুলো প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। এক সেকেন্ডের মধ্যে আলো জ্বালিতে চাই আমরা, কিন্তু ভুলিয়া যাই বাতিটি প্রস্তুত করাই হলো প্রধান কাজ। [বাণী ও রচনা (৩য়) ৩৪৯]

(খ) তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ বসিয়া আমার কথা শুনিতে পার। কিন্তু অভ্যাস না করিলে এক বিন্দুও অগ্রসর হইতে পারিবে না। সবই সাধনের উপর নির্ভর করে। ...নিজে অনুভব করিতে হইবে, কেবল ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না।’’ [বাণী ও রচনা (১) ১৭৭]

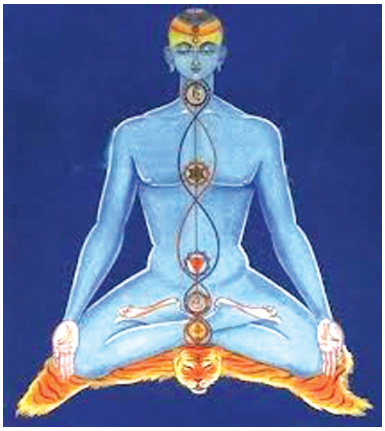

(গ) নির্দিষ্ট আসন, নির্দিষ্ট প্রণালীতে শ্বাস ক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্যে মন শান্ত ও একাগ্র হয়। এগুলি অভ্যাসের সঙ্গে পবিত্রতা এবং ভগবান লাভের বা সত্যোপলব্ধির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই।

...ধীর, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় যুক্ত সাধন সহায়ে ইচ্ছা-শক্তিকে পরিপুষ্ট করিতে হয়। ইহা ছেলেখেলা নয়, একদিন চেষ্টা করিয়া পরের দিন ছাড়িয়া দিবার মতো খেয়ালও নয়। সারা জীবনের কাজ এটি।’’ [বাণী ও রচনা (৩) ৩১৫]

আপনি আচরে ধর্ম...

(১) (সকাল) সাড়ে পাঁচটার সময়ে আসনে উঠিয়া বসিলাম। সন্ধ্যা, হোম, চণ্ডীপাঠ করিয়া গায়ত্রীজপ আরম্ভ করিলাম। ত্রাটক ও কুম্ভকযোগে পাঁচশত গায়ত্রী জপ হইল। ৮ থেকে ১০টা পর্যন্ত নাম জপ করিলাম। অবিচ্ছেদ কুম্ভকের সঙ্গে মণিপুরে বসাইয়া নাম করিতে বড়ই আরাম হইল।... এই চক্রে বসাইয়া নাম করাতে চিত্ত নামে খুব নিবিষ্ট হয়।... কুম্ভক করিতে বড়ই আরাম বোধ হয়। —কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৬) আর আর দিনের মতো রাত্রি ১টার সময়ে জাগিলাম। হাত- মুখ ধুইয়া শুষ্ক মোটা কাঠের ধুনি জ্বালাইয়া আসনে বসিলাম; প্রাণায়াম, কুম্ভক যথা নিয়মে করিয়া নাম করিতে লাগিলাম। —কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।

সংকলক—নীলমণি চক্রবর্তী

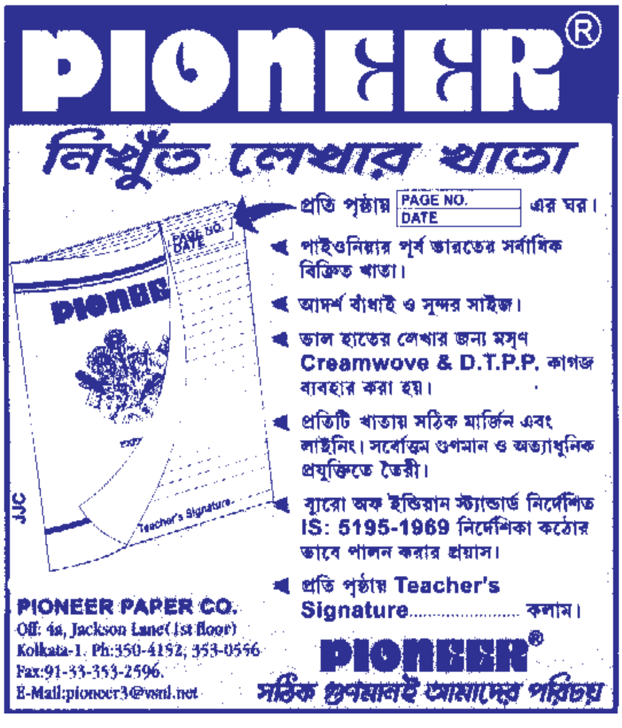

নবাঙ্কুর

সন্দেশ-কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
প্রথম সংখ্যা 'সন্দেশ'-এর ভূমিকা
(প্রথম বর্ষ। বৈশাখ ১৩২০)

একটি বাঙালীবাবু এলাহাবাদে ডাক্তারি করিতেন, তাঁহার একটি বিহারী কাজের লোক ছিল। লোকটি সবে পাড়া-গাঁ হইতে আসিয়াছে, শহরের চাল-চলন এখনও ভাল করিয়া শিখে

নাই, আর বাঙালীর রীতিনীতি কিছুই জানে না।

বাবু তাহাকে বলিলেন, ''দেখ, দু'আনার সন্দেশ কিনিয়া আন ত।" লোকটি দু'আনার পয়সা লইয়া সন্দেশ কিনিতে বাহির হইল, আর ভাবিল সে কি বিপদেই পড়িয়াছে। 'সন্দেশ' বলিলে তাহার দেশের লোকে বুঝে 'সংবাদ', সে জিনিস যে আবার কি করিয়া পয়সা দিয়া কিনিতে পারা যায় আর গেলেও তাহা যে কোথায় মিলে, তাহা সে কোনোমতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। কাজেই বেচারা কি করে? সে পয়সা ক'টি হাতে লইয়া পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। যে আসে তাহাকেই বিনয় করিয়া বলে, ''এ ভাইয়া। দো আনাকা সন্দেশ কাঁহা মিলি?"

এ কথা যে শোনে সেই হাসে। শেষে একজন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, ''সন্দেশ বলিতে তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহা নয়, বাঙালীবাবুরা এক রকম লাড্ডু খায় তাহারই নাম 'সন্দেশ'। ময়রার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।"

তখন সে ভারি খুশী হইয়া ময়রার দোকান হইতে সন্দেশ কিনিয়া আনিল, আর মনে করিল খুব একটা কাজ করিয়াছে।

কাজের লোকটি বেচারা লাড্ডুকে খবর ভাবিয়া ভাবনায় পড়িয়াছিল। আমরাও যদি

লাড্ডু বলিতে খবর বুঝিয়া লই, তাহাতে কাজের অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু খবরকে যদি লাড্ডু মনে করা যায় তবে সেটা বোধ হয়, তেমন দোষের কথা হয় না।

লাড্ডু খাইবার জিনিস। সে জিনিস ভাল হইলে মিষ্টিও লাগে বলও বাড়ে। ভাল বস্তু খাইয়া যেমন শরীরে বল হয়, তেমনি ভাল কথা জানিয়া মনে বল হয়, উহাই মনের আহার। তাহা যদি মিষ্ট হয়, তবে তাহাকে মনের লাড্ডু বলিতে দোষ কি?

'সন্দেশ' বলিলেই যে আমরা সকলের আগে একটা খাইবার জিনিসের কথা ভাবি সে আমাদের অভ্যাসের দোষ। ওই শব্দের আসল অর্থ যে 'সংবাদ' সংস্কৃত অভিধান খুলিয়া দেখিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 'সংবাদের' অর্থ বদলাইয়া 'মিঠাই' হওয়া খুবই

আশ্চর্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ঘটনা একেবারে অসম্ভব নহে। আজকাল যেমন 'তত্ত্ব' পাঠান হয়, তেমনি আগে হয়ত লোকে 'সন্দেশ' পাঠাইত। তত্ত্ব, কিনা, কুশল মঙ্গলের সংবাদ, সেইটিই আসল কথা, সঙ্গের মিষ্টান্ন এবং উপহার স্নেহের চিহ্ন মাত্র। কথা এই বটে, কিন্তু কাজে এখন দাঁড়াইয়াছে— কেবল মিঠাই সন্দেশ, আসল খবরের কথা চাপা পড়িয়াছে। সে খবর না থাকিলেও কেহ কিছু মনে করে না, কিন্তু মিঠাই না থাকিলে হয়ত চটে। 'সন্দেশে'র বেলায়ও বোধহয় এমনিতর একটা কিছু হইয়াছিল, আর 'তত্ত্বে'রও হয়ত কালে 'সন্দেশে'র দশা হইয়া উহা ময়রার দোকানে সের হিসাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক, আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার উহা খাইতে ভাল লাগে, আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি 'সন্দেশ' নাম লইয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইতেছে। ইহাতেও যদি এই দু'টি গুণ থাকে,— অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার 'সন্দেশ' নাম সার্থক হইবে।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

সন্দেশ ও আমরা

কৌশিক গুহ

'সন্দেশ' পত্রিকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড়, গভীর। উপেন্দ্রকিশোরকে দেখেননি তাঁর নাতি সত্যজিৎ। তবে ওই পত্রিকার কথা অনেক শুনেছেন মায়ের কাছে, কাকাদের কাছে, পিসিদের মুখে। একটা টান তৈরি হয়ে গিয়েছিল। চলচ্চিত্রকার হিসেবে সত্যজিতের নামডাক হয়েছে যখন, তাঁর মা সুপ্রভা বললেন, 'বাবা-ঠাকুর্দার স্মৃতিজড়ানো কাগজটা নতুনভাবে বের করলে খুশি হবো।' মায়ের কথা মন দিয়ে শুনে সিদ্ধান্ত নিলেন কাগজ বের করবেন। সন্দেশ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ছোটোদের জন্যে ভাবনা। 'সন্দেশ' এখনও বেরোচ্ছে। সম্পাদক সন্দীপ রায়। রায় পরিবার বংশপরম্পরায় এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক পাঠকদের 'সন্দেশী' বলা হয় বরাবর। অনেক পাঠকও 'সন্দেশী' ওইরকম বংশপরম্পরায়।

বই কথা কই

বইকে বন্ধু করে নিতে পেরেছে সপ্তর্ষি

বই কেনার জন্যে প্রতিমাসে কিছু টাকা জমায় সপ্তর্ষি। একটু কষ্ট করেই জমাতে হয়। টিফিনের জন্যে মা রোজ দশটাকা দেয়। পাঁচটাকার টিফিন খায়। পাঁচ টাকা জমায়। মাসের শেষে কিছু জমে যায়। তা দিয়ে কোনো-না-কোনো বই কিনে ফেলে। বই যত্নে রাখে। স্কুলের পড়ার বইয়ের বাইরে অবশ্যই পড়ার জন্যে সময় খুঁজে নেয়। ভালো লাগে তার। পড়ার সঙ্গে খেলাও তার পছন্দের কাজ। ঠাকুমা বলত : 'ছোটোদের তিনটে কাজ— খেলা খাওয়া পড়া। তবেই হবে জীবনটাকে গড়া।' সপ্তর্ষি অতশত ভাবে না। খেলার সময় অন্য কোনো দিকে মন দেয় না। শচীন তেন্ডুলকর তার খুব পছন্দের খেলোয়াড়। শচীন কত খেটেছেন বড়ো হওয়ার জন্যে। অনুশীলন একটুও ফাঁকি থাকেনি। স্কুলে খেলার সময় সপ্তর্ষির ডাক পড়লে সে অবশ্যই সাড়া দেয়। সবাই মিলে খেলার মজাই তো আলাদা। কারা জিতল কারা হারল সেটা বড়ো ব্যাপার নয়। খেলাটাই আসল। ছুটির পরে বাড়ি ফেরার সময় গায়ে জামায় ধুলো লেগে থাকত। মা কোনোদিন তো বকেনি সেজন্যে। বরং বলেছে, 'জামা প্যান্ট বদলে খেয়ে নাও।' খাওয়ার সময় ব্যাগ থেকে বই বের করে। কিংবা বাড়িতে থাকা কোনো বই বেছে নেয়। বইয়ের ছাপা পাতার মধ্যে সে আকর্ষণ খুঁজে পায়। তাকে অনেকে বই দেয়। অনেকে মানে বাড়ির লোকজন। বই পেলে খুব আনন্দ তার। নিজের জমানো পয়সায় বই কেনার আনন্দ অন্যরকম। কেউ কেউ বই কেনে বা পায়। পড়ে না। সপ্তর্ষি না পড়ে থাকতে পারে না। নিজের বইপত্র ঠিকভাবে গুছিয়ে রাখার অভ্যেস রয়েছে তার। বইকে বন্ধু করে নিতে পেরেছে। বাংলা ইংরেজি দুটো ভাষা লেখায় বই পড়ে। যখন খুব ছোট ছিল পড়তে পারত না। তারপর পড়তে শিখল। সুখলতা রাও-এর লেখা 'নিজে পড়ো' বইটা তার বড় পছন্দের ছিল। সত্যিই নিজে পড়ার আনন্দ অন্যরকম। তার কয়েকজন ছোটো ছোটো বন্ধু আছে। তাদের সঙ্গে খেলে। নানান গল্পও বলে তাদের। সেইসঙ্গে বলে, 'পড়া অভ্যেস কর। দেখবি কত মজা পড়ায়।' নিজের দলে এখন অনেককেই পেয়েছে সে। কতজন বলে, 'এখন আর কেউ আর বই পড়তে চায় না।' সপ্তর্ষি সেসব কথাকে পাত্তা দেয় না। সে শুধু বলে, 'আমার তিনটে কাজ--- খাওয়া-খেলা-পড়া— সে কাজ ঠিকমতো করতে পারছি কিনা খেয়াল রাখবো। মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলবো।'

বইমিত্র

সহদেবের সাহস

ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে বিবাহ সাতজন্মের বন্ধন। পরিবারের দায়িত্বশীল অভিভাবকরা কুল, গোত্র, শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তরকম খোঁজখবর নেওয়ার পর, সহমতের ভিত্তিতে অগ্নি সাক্ষী রেখে স্ত্রী-পুরুষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করে।

আমরা ভারতীয় চিন্তাধারার অনুসারী। এখানে সমস্ত সমস্যার সমাধান ভারতীয় পরম্পরার নিরিখেই করা হয়। কিন্তু এখন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে আমরা মূলভূত সিদ্ধান্ত থেকে সরে গিয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারার শরণাপন্ন হই। পৃথিবীর তাবৎ চিন্তাবিদের মতে, সমস্ত সমস্যার নিদান ভারতীয়ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে। দেশে এখন সবচেয়ে বড় আকারে দেখা যাচ্ছে পরিবার ভেঙে যাওয়া অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ।

ভারতে একসময় সংযুক্ত পরিবারের প্রভাব ছিল। পরিবারের কোনো সমস্যা পরিবারের কর্তার হস্তক্ষেপেই সমাধান হোত। পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে কেউ গেলে তার কোনো সম্মানই থাকতো না। বর্তমানে একক পরিবার কল্পনাই দেশে বিবাহবিচ্ছেদ বাড়িয়ে দিচ্ছে। একক পরিবারে মান-অভিমান, সুখ-দুঃখের কেউ ভাগীদার থাকে না। সংযুক্ত পরিবার প্রথা গ্রহণ করলে বিবাহবিচ্ছেদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া স্ত্রী বা পুরুষ মানসিকভাবে হীনমন্যতায় ভোগেন। আপনজনদের মধ্যে তাঁরা খুব একটা সম্মান পান না। বিবাহের ফলে যে সামাজিক সম্মান পেয়েছিল, বিবাহবিচ্ছেদের ফলে সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা আধুনিক শিক্ষার যতই দোহাই দিই না কেন বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া স্ত্রী বা পুরুষের সামাজিক মান্যতা কিছুই থাকে না।

আজ প্রায় দেখা যায়, কোনো কোনো মা-বাবা বিয়ের পরেও মেয়ের প্রতি খুব বেশি সহানুভূতি দেখান। ছোট-খাটো কথাকেও বড় করে ফেলেন। কোনো কোনো বিষয়ে মা-বাবার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে মেয়ের পারিবারিক জীবন নষ্ট হয়ে যায়। বরং মা-বাবার উচিত মেয়েকে এমন সংস্কার দেওয়া যাতে সে সুখে তার দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করতে পারে।

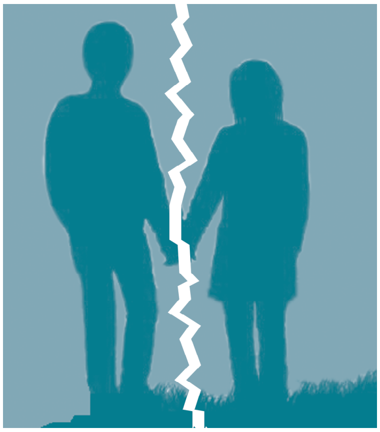

বিবাহবন্ধনের সৌন্দর্যকে নষ্ট করছে বিবাহবিচ্ছেদ

শুভশ্রী দাস

আমাদের দেশের একটা বড় বিড়ম্বনা যে, দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্যের চিন্তাধারাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। ইয়াংকি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের ধারণা বিবাহ কোনো সংস্কারই নয়, বরং স্ত্রী-পুরুষের প্রবৃত্তি পূরণের মাধ্যমমাত্র। কেউ কেউ এমনও আছে যারা মনে করে নারী শুধুমাত্র ভোগ্যবস্তু। লিভ-ইন-রিলেশনকে মান্যতা দেওয়া এই ভাবনাকে বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এর কুফলও বিবাহবিচ্ছেদ। সম্প্রতি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ফেসবুকে অত্যধিক আসক্ত দম্পতিদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ক্রমবর্ধমান।

দেশে নিত্যনতুন আইন তৈরি হওয়ার ফলেও বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ছে। দণ্ড সংহিতার ৪৯৮-এ এবং ৩০৮-বি ধারা মহিলাদের ওপর অত্যাচার বিষয়ক আইন ছিলই। আবার ২০০৫ সালে 'পারিবারিক হিংসা নিরোধক আইন' তৈরি হওয়ার ফলে পরিবারের কোনো তুচ্ছ কারণে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে।

দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে গজিয়ে উঠছে এনজিও। যেগুলিতে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে বিবাহবিচ্ছিন্ন স্ত্রী বা পুরুষ কাজ করছে। এরা নিজেরাই সুখী দাম্পত্যজীবন নির্বাহ করতে পারেননি, তবু দেশের বিভিন্ন স্থানে সৎ পরামর্শের নামে পরিবার ভাঙার কাজেই উৎসাহ দিচ্ছে। তুচ্ছ কারণে হওয়া মনোমালিন্যের জন্য এরা স্ত্রী-কে স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে। ফলস্বরূপ বিবাহবিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এর দুষ্প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই তাদের সন্তানের ওপর পড়ছে।

ভারত পুরুষতান্ত্রিক দেশ হলেও নারীকে এখানে ভোগ্যা মনে করা হয় না। তাদেরকে লক্ষ্মী, পার্বতী, সীতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। সমস্ত মাঙ্গলিক কাজে স্ত্রী-র অগ্রাধিকার থাকে। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর সম্পর্ক অটুট রাখে সুষ্ঠুভাবে পরিবার চালানোর জন্য। কিন্তু পুরুষের বিরুদ্ধে এমন সব আইন তৈরি হয়েছে তাতে পুরুষরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতেই ভয় পাচ্ছে। দাম্পত্য জীবন সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করতে পারলেই বিচ্ছেদের সংখ্যা কমে যাবে।

হিন্দু চিন্তাভাবনাই পরিবারকে বেঁধে রাখতে পারে। আজ সমাজে হিন্দু বিবাহ সংস্কার ও তার ভাবনা স্ত্রী-পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক করে তোলে। পাশ্চাত্য ভাবনার বাড়ন্তের জন্য এবং নিত্যনতুন তৈরি আইনের জন্য দিন দিন বিবাহবিচ্ছেদ বেড়েই চলেছে। এছাড়া, স্ত্রী-পুরুষ বিনা বিবাহে একসঙ্গে থাকাও এই কুপ্রথাকে উৎসাহিত করছে। অতিমাত্রায় অবাধ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আমেরিকা ও চীনে বিবাহবিচ্ছেদ সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে কম ভারতে। শতাংশের হিসাবে ১.০১ হলেও ক্রমশ তা বৃদ্ধির দিকে।

এমতাবস্থায় দেশের যুবসমাজের মধ্যে ভাবনা জাগ্রত করতে হবে যে, বিবাহ শুধুমাত্র শারীরিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমমাত্র নয়, দেশ জাতির কল্যাণে আগামী প্রজন্ম আনার একটি পবিত্র সংস্কার।

অতিথি কলম

তভলীন সিং

কেন মোদী এত জনপ্রিয় ?

তভলীন সিং

লক্ষ্য করে থাকবেন ২০১৪-র এই সাধারণ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই যেন মনে হচ্ছে ১৯৭৭ সালের সেই যুগান্তকারী নির্বাচনের পর এটিই হতে চলেছে সবথেকে রুদ্ধশ্বাস ও গুরুত্বপূর্ণ এক নির্বাচন। দূর অতীতের সেই বছরটিতে ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী 'আড়াআড়ি দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। দেশ তখন সদ্য জরুরি অবস্থার কবল থেকে ছাড়া পেয়েছে। বিভাজনের এক দিকে ছিলেন এক স্বৈরতন্ত্রী শাসক ও তাঁর দুর্বিনীত পুত্র, অন্যদিকে অবিন্যস্ত নানান মতাদর্শের এক ছিন্নভিন্ন মরিয়া বাহিনী যারা দেশকে স্বৈরতান্ত্রিক নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই সন্ধিক্ষণে দেশের ভোটদাতারা কিন্তু এই অবিন্যস্ত, বিচিত্র রাজনৈতিক চিন্তাস্রোতের প্রার্থীদেরই বেছে নিয়েছিলেন। তার মূল কারণ ছিল মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে অনুভব করেছিলেন গণতন্ত্র হারানোর যন্ত্রণা কী জিনিস। এবারের নির্বাচন ক্রমশই যেন অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে এক আশু

লড়াই-এর চেহারা নিচ্ছে। ভারত সম্বন্ধে এক প্রাচীন ধ্যানধারণা বহনকারী ও এক সম্পূর্ণ নতুন ভবিষ্যতের দিশারির মধ্যে আজ সম্মুখ সমর। বলা ভাল, কংগ্রেস দল ও আম আদামী পার্টি এবং ভোটের পদধ্বনি শোনা গেলেই যে 'ধর্মনিরপেক্ষী সমাজতন্ত্রীরা' মাথাচাড়া দেয় তারাই এই পুরনো ধ্যান- ধারণার বিক্রেতা। ক'দিন আগেই রুগ্ন পদক্ষেপে আহ্লাদের তৃতীয় ফ্রন্ট নিয়ে তারা নাড়াচাড়া শুরু করেছে।

ভারত সম্বন্ধে এই পুরনো ধ্যানধারণা আসলে কি? এক কথায় স্বাধীনতার ঊষালগ্নে নেহরু প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক মডেল অনুসরণ করেই আজকের ভারত চলতি স্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। যেখানে রাজনীতিবিদ, আমলা, কেরানি, পিওনের এক বিপুল পরিকাঠামো খাড়া রয়েছে। দেশের নিরপরাধ জনগণ অবাক বিস্ময়ে দেখছে এই বিপুল সরকারি বাহিনী তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মেটাতে আজও অক্ষম। তারা আজ অস্থির শুধু নয় ক্রুদ্ধও। দেশের বিশাল যুবসমাজ হতাশায় ছটফট করতে করতে দেখছে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের ছেলেপুলেরা কেমন অনায়াসে কোটিপতির জীবনযাপন করছে আর তারা হাতড়ে মরছে চাকরির এক জলাশয় যা গত ১০ বছরে শুকিয়ে গেছে। এই কারণেই আম আদমী পার্টির দালাল সুনিপুণভাবে সব দোষ একচেটিয়া পুঁজি (Chrony Capitalism)-এর ওপর চাপিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছে। একবারও তাদের ভাবতে ইচ্ছে করছে না যে এই বস্তুটি তো রাষ্ট্রের ভ্রান্ত মডেল অনুসরণ করার ফলেই সৃষ্টি। তাদের মনে হচ্ছে এর জন্য কর্পোরেট ভারতই দায়ী।

সব থেকে নিরাশাব্যঞ্জক হচ্ছে, এই প্রাচীন ধ্যানধারণায় আস্থাবান ও দোষারোপকারীদের সঙ্গে আলাপ করলে দেখা যাবে তারা অসুখ সারাবার যে নিদান দিচ্ছে— তা ইতিমধ্যে ব্যবহৃত ও সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাদের ভোট বক্তৃতাগুলিতে সদাই ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজবাদ, দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে একঘেয়ে তাঁবাদী ভাবনাগুলি বিতরিত হচ্ছে। দুর্নীতির ওপর 'লোকপাল' বিল আনা নাকি একেবারে নতুন বিষয়। এটি আসলে ৪০ বছরের পুরানো। এই নতুনত্বের ধ্বজাধারীরা এখন বুঝে গেছে এগুলি আজ অচল। তাই তারা সকলে কটু কথায় ভরিয়ে দিচ্ছে সেই মানুষটিকে যাকে তারা যেমন ঘৃণা করে তেমনি যমের মতো ভয় পায়। তিনিই তো নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী।

কেন এই আতঙ্ক?

এর প্রথম কারণ সারাদেশ ব্যাপী তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা। বিভিন্ন সমীক্ষায় এই জনপ্রিয়তার পারদের অপ্রতিরোধ্য গতি প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। বারবার তাঁকে প্রাচীনপন্থীরা সোনিয়া গান্ধীর সেই কুরুচিকর 'মৃত্যুর ফেরিওয়ালা' অভিধানটির কথা নির্বাচকমণ্ডলীকে স্মরণ করিয়েও তাঁর জনপ্রিয়তার বৃদ্ধিকে রুখতে পারছে না। এই ক্ষীণ দৃষ্টিধারীরা নজর করছে না মোদীর জনপ্রিয়তা বাড়ার মূলে রয়েছে জনতাকে এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখানোয় তাঁর

অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাফল্য। সম্প্রতি দিল্লীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহলের আহূত এক সভায় তিনি বিষয় ধরে ধরে ব্যাখ্যা করেছেন--- প্রধানমন্ত্রীর পদে বসলে কি হবে তাঁর প্রাথমিকতা। কোন কোন ক্ষেত্র থাকবে অগ্রাধিকারের তালিকায়।

এ প্রসঙ্গে তিনি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন যে ভারতের আসল শক্তি রয়েছে তিনটি ডি-এর--- ওপর ডেমোক্রেসী, ডেমোগ্রাফী ও ডিম্যান্ড (গণতন্ত্র, জনসংখ্যাতত্ত্ব, চাহিদা)। অন্যদিকে দেশের চরম দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি হলো শাসন ব্যবস্থায় ব্যর্থতা, অনৈতিকতা, বিশ্বাস যোগ্যতা ও আশাহীনতা। বিশদে গিয়ে তিনি তাঁর অভিমতে জানিয়েছেন প্রথম অগ্রাধিকার সুশাসন। অথচ একথা বোঝাতে গিয়ে তিনি আদৌ উল্লেখ করেননি যে আমূল কোনো প্রশাসনিক পরিবর্তন জরুরি। পক্ষান্তরে নিজের গুজরাট অভিজ্ঞতা থেকে কিছু ছোটো ছোটো উদাহরণ তুলে ধরেছেন। মনে রাখতে হবে তিনি একাদিক্রমে ১২ বছরের এক অত্যন্ত সফল প্রশাসক।

পরিবর্তনের অগ্রাধিকার

গড়পড়তা ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবন যাপনের মান উন্নয়ন করতেই হবে। দেশের তরুণ সম্প্রদায় যেন দেশের মধ্যে এমন একটা পরিবেশ প্রায় যেখানে তারা মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে। আর এর জন্য প্রথম প্রয়োজনই হচ্ছে একটা ভদ্রস্থ জীবিকার। দেশের গ্রামীণ অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার কোনো পথ নেই। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, স্বচ্ছ পানীয় জল ও জীবনযাত্রার একটা গ্রহণীয় মান যাকে সত্যি সত্যিই মানুষ মেনে নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর চমৎকার উপলব্ধি ব্যাখ্যা করে বলেছেন গ্রামগুলির মধ্যেই থাকবে দেশবাসীর আত্মা কিন্তু তারা শহরাঞ্চলের সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করার অধিকার তো পেতেই পারে। সেই ভাবেই করতে হবে গ্রামের উন্নয়ন। তাঁর কথায় গ্রামের শহরীকরণ কোনো সমস্যা নয়, এটি একটি সুযোগ।

এখানে আমার মতো উন্নাসিক ও ছিদ্রান্বেষীরও বলতে দ্বিধা নেই, মোদীর দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে পরিকল্পনার কথাগুলি আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীর মধ্যেই ভারতকে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করার ডাক দিয়েছেন। গান্ধীজী সারাজীবন দেশের মানুষকে পরিচ্ছন্নতা ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা বলে এসেছেন। তাঁর জন্ম সার্ধশতবর্ষে নির্মল ভারতই হতে পারে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি। এছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিগুলি মেনে চললে বিপুল চিকিৎসা খরচ করার থেকে স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। তিনি এমনই সব সহজ সরল অথচ বাস্তব বিষয় নিয়ে যে সরস আলোচনার মাধ্যমে সমাধান নির্দেশ করছিলেন সেগুলি সবই গ্রহণীয় এবং করে দেখানো আদৌ কঠিন নয়।

এই লেখার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব সকলেই সম্ভব হলে youtube এর মাধ্যমে তাঁর সম্পূর্ণ ভাষণগুলি শুনুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন আজ মোদী প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে সবার আগে।

তিনি হতাশা, বিমর্ষতায় আচ্ছন্ন এক দেশের নাগরিকদের উত্তরণের পথ দেখাচ্ছেন। তিনি তাদের এক সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবার নিশ্চিত দিকনির্দেশ নিয়ে এসেছেন। যখন দেশের অর্থব্যবস্থা স্মরণাতীত কালের মধ্যে অবনমনের সব রেকর্ড চূর্ণ করেছে সেই দুর্দশাগ্রস্ত দেশবাসীকে তিনি নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন মর্যাদা ও অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের। তাদের বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে, কেননা প্রাচীন ভারতের ভাবনাধারীরা তো এই দারিদ্র্যের নাগপাশে আশু মৃত্যুবরণকারীদের শুধুমাত্র কিঞ্চিৎ দারিদ্র্যের উপশমের বস্তাপচা বাণী শোনাচ্ছে।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS
"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER
OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"
OUR SERVICES :
** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment
CONTACT :
Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com
web : www.calcuttawaterproofing.com

Ori Plast
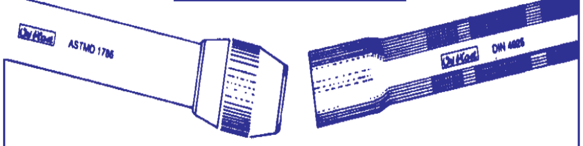
P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes
Authrorised Distributor :
NATIONAL PIPE & SANITERY STORES
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
PARTHA SARATHI CERAMICS
4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

পরিবর্তনের কীর্তন

শ্রীচৈতন্য বর্ধন

ঢাকে কাঠি পড়েছে। এ কিন্তু গাজনের ঢাক নয়। এ হলো পাঁচ বছরের নিদ্রামগ্ন জনগণকে আসন্ন লোকসভা ভোট সম্পর্কে সজাগ করতে গণতন্ত্রের ঢাক বলাই সঙ্গত। রাজনৈতিক দাদা-দিদিরা পাঁচ বৎসরের জন্য জনগণকে গণতন্ত্রের আফিঙ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। পাঁচ বছরের মেয়াদ অন্তে হঠাৎ তাদের ঘুম ভাঙিয়ে তারা যে 'King-maker' সেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। কাঁচা ঘুম ভাঙা চোখে অবোধ জনগণ ভেড়ার পালের মতো আবার ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দাদা দিদিদের কথার ফুলঝুরিতে ভুলে গিয়ে নিজেদের কবর খোঁড়ার পথ পরিষ্কার করে দিয়ে আসে ও পরে অসহায়ের মতো কপাল চাপড়ায়। এই ভোটবাজিতে যে যত পারদর্শী সে তত বড় ধূর্ত শিয়াল বা পলিটিশিয়ান। এদের ভোট বাগাবার কলাকৌশলকে বিষয়বস্তু করে জনৈক পল্লীগীতিকার ভোটরঙের গান গেয়ে চলেছেন :

দেশে আবার এলো ভোট
দেশে আবার এলো ভোট।
কে কোথায় আছিস আয়রে—
ভোটের মধু লোট।
আবার ভোটের তরে— লেজা-মুড়ায়
বাঁধরে তোরা জোট।।
আবার এলো ভোট।

ভোটার সব একদিন্‌কা সুলতান
তোরা তাদের খিদমতগার।
আকাশের চাঁদ পেড়ে দিবি
করিস এমনি অঙ্গীকার।।
বাড়ির পোষা মেনির মতো
পায়ের ওপর লোট।
জিতলে পরে দেখাস তখন
ছাগের ওপর বাঘের চোট।।
দেশে আবার এলো ভোট।

সাধু সাজবি হাত কচলাবি
হাসবি একটু মিটি মিটি।
তোরা যে সব পারের যাত্রী
ভোটার হলো ভুটভুটি।।
ভোট-বৈতরণী পার করিতে
মূর্খ ভোটার জলি বোট।

রাতবিরেতে পথে ঘাটে
পায়ে মাথা কোট।।
দেশে আবার এলো ভোট।

ভোটের আগে হাত ধর
ভোটের সময় পায়ে পড়,
ভোটে জিনিলে পর—
মাথার উপর ওঠ।
তখন বিড়ি ফেলে সিগারেট ধরবি
গায় চাপাবি জহরকোট।।
দেশে আবার এলো ভোট।

জিতলে পরে নির্বাচনে
ভোটার যাবে নির্বাসনে;
তখন তুই সাজবি রে সোনার চেইনে—
ও তোর গিন্নীর মাজায় উঠবে
গোট।

তখন জনগণের পকেট কেটে—(হরি হরি বল মন)...
লাগাবি রে হরির লুট।।
দেশে আবার এলো ভোট।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সর্বজনীন নগর কীর্তনের মতো কে নেই ভোট কীর্তনে। "যত সব নাড়া বুনে : সব হল কীর্তৃনে" —এই গ্রাম্য কথার মতো ভোট কীর্তনেও জনগণকে উদ্ধার করতে অনেক অবতারের আবির্ভাব হয়েছে— তারা কেউ ফুটবল ছেড়ে ভোট- কীর্তনের খোল বাজাচ্ছে, কেউ চলচ্চিত্রের সাজপোষাক ত্যাগ করে ভোট-বৈরাগীর ডোর-কৌপীন ধারণ করেছে, কেউ ছাত্র-ঠ্যাঙানি ছেড়ে বেতরিবত্ জনগণকে শিক্ষা দিতে মাঠে নেমে পড়েছে। ইত্যাকার ভোল বদলের কসরত চলছে। "সর্বশাস্ত্রে বীজ হরিনাম দ্বি-অক্ষরের" মতো এদের সবার বীজমন্ত্র 'দিদি' নামৈব কেবল্ ।

মহাপ্রভুর জগাই-মাধাই উদ্ধারের মতো গৌড়-বঙ্গের বাঙালি জগাই-মাধাইদের উদ্ধারের জন্য দিদি-অবতারের আবির্ভাব ঘটেছে। বাঙালির অবশিষ্ট ছাল-চামড়া উৎপাটন করে পরিবর্তনের রসকলি প্রত্যেক বাঙালির কপালে অঙ্কিত করে দেওয়া হবে— যা শত ঘষাঘষি মাজামাজিতেও মুছবে না। সাধু সাবধান!

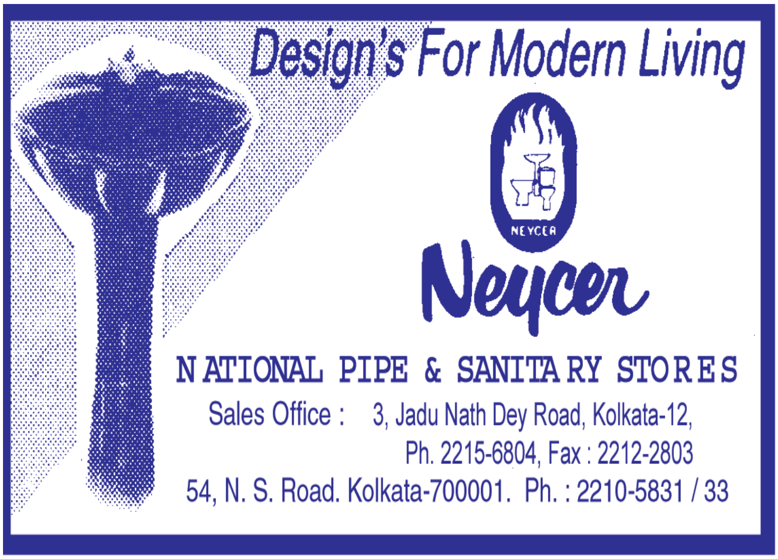

কেরলে হিন্দু ভাবাবেগে আঘাতের প্রতিবাদে সোচ্চার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেরলের দু'টি বিখ্যাত প্রভাবশালী হিন্দু সংগঠন হিন্দু জাগৃতি সমিতি এবং সনাতন সংস্থার আদর্শে অনুপ্রাণিত ধর্মীয় ও বৈদিক শিক্ষার মতো শক্তিশালী সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে।

হিন্দু-বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদসভা।

গত কয়েকমাস ধরে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও নিউজ চ্যানেলগুলির দিকে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে, সারাদেশের বিভিন্ন মঠের সাধুসন্ত ও মন্দিরের পূজারিরা নানা অসামাজিক কাজে যুক্ত— এমন বিষয় প্রচার করা হচ্ছে। যেমন কিছুদিন পূর্বে কাঞ্চী কামকোটী পীঠের শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্রসরস্বতী এবং মাতা অমৃতানন্দময়ী দেবীর মতো যাঁরা হিন্দু সমাজের মানুষের কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র তাঁদের অপদস্থ ও ফাঁসানোর এবং হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করার জন্য বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশ করে চলেছে।

এই সমস্ত হিন্দু-বিরোধী এবং জাতীয়তা বিরোধী অশুভ শক্তির গভীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে কেরলের ধর্মীয় সংগঠনগুলি সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে। এছাড়াও অমৃতানন্দময়ী মঠের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত অস্ট্রেলিয়ান নিবাসী এক লেখিকা গেল টেডওয়েলও এই হিন্দুবিরোধী গভীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, ''হিন্দু-বিরোধী সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মকে শেষ করার চক্রান্ত করছে।

কেরলের 'হিন্দু জাগৃতি' ও 'সনাতন সংস্থা' জানিয়েছে, হিন্দুবিরোধী সংগঠন ও ক্ষমতাসীন মার্কসবাদী পার্টি হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করতে চাইছে। গত কয়েকবছর ধরে এখানে হিন্দুজাতির ধর্মীয় আবেগকে আঘাত করতে এরা শিকারী কুকুরের মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সমগ্র কেরল জুড়ে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সাধু-সন্তদেরকে জোর করে অপদস্থ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এই হিন্দুবিরোধী ষড়যন্ত্রকে মদত দিতে খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরাও মার্কসবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মাতা অমৃতানন্দময়ীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে সনাতন সংস্থা।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার, গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063, Mobile : 9733387091

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

কেরলে রক্তাল্পতায় ভুগছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভোটের দামামা বেজে গেলেও সিপিএম এই মুহূর্তে উদ্দীপনার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। বরং রয়েছে একধরনের অজানা আতঙ্ক। রাজনৈতিক মহল বলছেন রক্তাল্পতায় ভোগা এহেন সিপিএমকে স্বাধীনোত্তর ভারত কখনও দেখেছে কিনা সন্দেহ। তাদের যে দু'টি ঘাঁটি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল সিপিএমকে কেন্দ্রে ছড়ি ঘোরাতে সাহায্য করতো সেখানেই এবার চূড়ান্ত বিপর্যস্ত সিপিএম। পশ্চিমবঙ্গে পার্টির যা হাল তাতে শরিকদের দু' একটা আসন জোটার পর এবার লোকসভায় সিপিএমের ভাগ্যে কতগুলো জুটবে তা নিয়ে সন্দিহান খোদ পার্টি নেতৃত্বই। এক্ষেত্রে যে কেরল তাদের আশা ভরসার কারণ হতে পারত সেই রাজ্যও সিপিএমকে আশাহত করার দিকেই এগোচ্ছে বলে প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলছে। সেখানে মোট ২০টি লোকসভা আসনের মধ্যে কমপক্ষে ১০টিও সিপিএমের ভাগ্যে জুটবে না বলে সমীক্ষায় ইঙ্গিত। অন্যদিকে পার্টির নিজস্ব বিশ্লেষণও এ বিষয়ে কোনো ভরসা তো দিতে পারছেই না, উপরন্তু সমীক্ষার চেয়েও ফল খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে।

কেরলের সিপিএম নেতৃত্ব এই মুহূর্তে যা নিয়ে সবচেয়ে উদ্বিগ্ন তা হলো তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনার অভাব, যা জোরদার প্রচারের প্রধান প্রতিবন্ধক। দ্বিতীয়ত, এর ফলে রাজ্যবাসীর কাছে নিজের শান্তি-প্রিয় দল হিসেবেও তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে সিপিএম। আর গভীর উদ্বেগের বিষয় হলো গত তিন বছরে রাজ্যে পার্টি সাফল্যের মুখই দেখেনি। সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্ব গোপনে এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন যে পার্টির নেতৃত্বাধীন এলডিএফ এবার মুখ থুবড়ে পড়তে পারে নির্বাচনে। তবে দলের নীচুতলার নেতৃত্বের ওপর রাশ ধরে না রাখতে পারার জন্যই আজকে যে পার্টির এই হাল তাও স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে কেরলে কংগ্রেসের সঙ্গে মাখামাখি করে ভূমি, বালি, খনি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের মাফিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং দলীয় কর্মীদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে বিলাসবহুল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা এই নির্বাচনে দলের বিপক্ষে যাবে বলে অনুমান।

গত ১-২৬ ফেব্রুয়ারি কেরলে পার্টির সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে যে কেরল রক্ষা যাত্রা হলো তাতেই দলীয় কর্মী ও

অচ্যুতানন্দ

বিজয়ন

সমর্থকদের হতাশাগ্রস্ত ও গা-ছাড়া মনোভাব নজরে আসে পার্টি-নেতৃত্বের। ২০১০-এর অক্টোবরে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ই অবশ্য দলীয় কর্মীদের এই মনোভাব পার্টির শীর্ষ-নেতৃত্বের নজরে এসেছিল। যার প্রতিফলন সেই ভোটের বাক্সেও পড়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল তো রয়েছেই। ভি এস অচ্যুতানন্দন গোষ্ঠীর সঙ্গে পিনারাই বিজয়ন গোষ্ঠীর সংঘর্ষের কথা সবারই জানা। কিন্তু এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকড় ছড়িয়েছে অনেক গভীরে। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে আবার উপগোষ্ঠী। তাই হৃতশক্তির সিপিএম এই মুহূর্তে আরও শক্তিহীন। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, বিরোধী দলনেতা অচ্যুতানন্দনের এখন দল সম্বন্ধে একেবারেই গরজ নেই। তিনি বরং দলীয় বিক্ষুব্ধদের মদত দিতেই উৎসাহী। যে কারণে ২০১০-এ পঞ্চায়েত নির্বাচনে পার্টির শোচনীয় হাল হয়েছিল। দলের গণতান্ত্রিক কাঠামো যে এর ফলে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত তা স্পষ্টতই ধরা পড়েছে। বিশেষ করে স্থানীয় ও শাখা কমিটিগুলোর সদস্যদের 'দেহ-ভঙ্গিমা' যে গোষ্ঠী-কোন্দলেরই বহিঃপ্রকাশ তেমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

কেরলে কংগ্রেসের সঙ্গে মাখামাখি করে ভূমি, বালি, খনি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের মাফিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং দলীয় কর্মীদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে বিলাসবহুল জীবন- যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা এই নির্বাচনে সিপিএমের বিপক্ষে যাবে বলে অনুমান।

ধর্ম কোনো ডগমা বা মত নয়, বিচারবুদ্ধিযুক্ত মূল্যবোধ

অমলেশ মিশ্র

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, আক্রান্ত হয়েও আত্মরক্ষার সংগ্রাম না করা--- জীবজগতের স্বাভাবিক নিয়ম নয়। মধ্যএশিয়া, আধুনিক পাকিস্তানে ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা গেল— যেখানে বৌদ্ধরা সংখ্যায় অনেক ছিলেন, ইসলাম দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর তারা কোনো প্রতিরোধ গড়লেন না যাতে আত্মরক্ষা করা যায়। ফল হলো এটা যে তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন এবং ভগবান বুদ্ধকে ত্যাগ করে আল্লাহ্র শরণ নিলেন।

ভারতবর্ষের ক্ষাত্রশক্তি, ভারতীয়দের নিজস্ব ধর্ম ও পরম্পরা রক্ষা করার তাগিদে বিদেশী শক্তিগুলির সঙ্গে হাজার বছরেরও বেশি যুদ্ধ করেছে। সেই আলেকজান্ডারের সময় থেকে মহম্মদ ঘোরী পর্যন্ত ভারতের ক্ষাত্রশক্তির ইতিহাস— আত্মরক্ষায় জন্য সংঘর্ষ ও নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাস। ভারতের ধর্ম, দর্শন ও পরম্পরার যতটুকু টিকে আছে--- তার পিছনে সংগ্রামী ভারতীয়দের আত্মবিসর্জনের উদার ও সমৃদ্ধ ভূমিকা আছে।

গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকে ইংরেজরা ভয় পেত না। ইংরেজরা ভয় পেত সেই ঘোষিত অহিংসা আন্দোলন যখন সহিংস হয়ে যেত এবং সহিংস বিপ্লবীরা যখন ক্ষাত্রশক্তির প্রেরণায় ইংরেজ বিতাড়নের জন্য মরণপণ করতেন। ভারতের শাসনভার যখন ইংরেজদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে এল, তখন তা ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তির হাতে এল না। তাই আজ ৬৫ বছর পরেও ভারতবাসী উপযুক্ত নেতৃত্ব পায়নি।

এই মানসিকতার সঙ্গে আরও একটি মানসিকতার কথা প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে যায়। সেটি হলো— পৃথিবী এবং পার্থিব জগৎ সম্পর্কে হিন্দু দর্শনের মায়াবাদ। এই পৃথিবী ও পার্থিব জগতের কোনো গুরুত্ব নেই— ঈশ্বর সান্নিধ্য ও মোক্ষলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। এই সার্বিক অহিংসা যোগী সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে হয়ত চলতে পারে যেহেতু তাঁরা মনুষ্যসমাজের বাইরে অবস্থান করেন এবং সাংসারিক জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ। কিন্তু সমাজের মধ্যে যারা সাংসারিক জীবন যাপন করেন— তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নয়। যাঁরা সব কিছুই ত্যাগ করেছেন— (Complete Renuniation) তাঁরা যত খুশি অহিংস ও মায়াবাদী হন, তাতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সেই ব্যক্তিরা নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। সমাজের ভাল বা মন্দ সম্পর্কে তাঁরা উদাসীন। তাঁদের ক্ষেত্রে যে অহিংসা চলে, সমাজে বসবাসকারীদের পক্ষে সেই অহিংসা চলে না। অহিংসা সম্পর্কে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ও জ্ঞান ভারতবাসীরা মহাভারত, রামায়ণ ও গীতা থেকে গ্রহণ করেছেন। ভারতের শাসনভার যাদের হাতে এল, তারা রামায়ণ, মহাভারত ও গীতার জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এমন মনে হয় না।

শত্রুসৃষ্ট হিংসা গান্ধীজীর কোনো ব্যক্তিগত ক্ষতি করেনি। তাই তিনি হিংসা ও অহিংসার তত্ত্ব কোথায় প্রয়োগ হবে তা উপলব্ধি করতে পারেননি। অধর্মের ভিত্তিতে সীতাদেবী অপহৃত হওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্রের মানসিক অবস্থা, অধর্মের ভিত্তিতে পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুত করার পর পাণ্ডবদের মানসিক অবস্থার যে স্বাভাবিক গতি তা গান্ধীজীর অহিংসা তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা বা সমর্থন করা যায় না। গান্ধীজীর অহিংসা তত্ত্ব একটি dogma (বিচারবুদ্ধিহীন বিশ্বাস) যা তার নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল। দেশের পক্ষে প্রয়োজন ছিল না। তার dogma তাকে মহৎ বা মহাত্মা করেছে দেশের ও দেশের মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে (at the cost of the Nation and the Country men). এই প্রসঙ্গে মত ও বিশ্বাস (Belief) এবং ধর্ম (Dharma) এই দু'টি বিষয়ের পার্থক্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। সকলের মত বা বিশ্বাস কখনও একই হতে পারে না। তাই 'সর্বমত সম্ভব' নামে কোনো তত্ত্ব হতে পারে না। মত বা বিশ্বাস বিভিন্ন। কোনো 'মত' ঠিক হতে পারে, কোনোটা বা বেঠিক হতে পারে। তবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবারই আছে। কিন্তু তারা কখনও বলতে বা দাবি করতে পারেন না যে তাদের মত বা বিশ্বাসই একমাত্র 'ঠিক' মত এবং সকলকেই তা গ্রহণ করতে হবে। ভারতীয় ভাবধারায় যে আদর্শ চিরকাল গৃহীত হয়ে আসছে তা হলো— মত পৃথক হতে পারে, পৃথক মত ও বিশ্বাস নিয়ে অনেক মানুষ নিজস্ব সম্প্রদায় তৈরি করতে পারেন। এ ব্যাপারে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারেন না। তবে, 'আমার মতটাই ঠিক এবং আমি পেশী শক্তি দিয়ে তোমাকে সেটা মানতে বাধ্য করি'— এই পথ ঠিক নয়।

ধর্ম বলতে একটি কল্যাণমুখী মূল্যবোধের সমষ্টি যা সমস্ত মানুষ ও জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মত এবং বিশ্বাস কখনও ধর্মের বিকল্প হতে পারে না। ধর্মের মধ্যে ন্যায় থাকবে, সত্য থাকবে, অহিংসা থাকবে, মমত্ব থাকবে, সহযোগিতা থাকবে। ধর্মের মধ্যে কোনো অসম্ভব কুসংস্কারের স্থান নাই। ধর্ম গতিশীলতা ও পরিবর্তনে আস্থা রাখে— ধর্ম কোনো dogma নয়, ধর্ম হলো বিচারবুদ্ধিযুক্ত মূল্যবোধ— যা পরস্পরের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং যা মানব সমাজের পক্ষে মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, তাকে প্রতিহত করে--- প্রয়োজনে মানবকল্যাণে যুদ্ধও করে।

মত ও বিশ্বাস অতিশয় ক্ষুদ্র কিন্তু ধর্ম বিশাল এবং ব্যাপক— তা মানব সমাজকে ধারণ করে রাখে।

অন্য রকম

শ্রীমতী দেবরানি শর্মার সঙ্গে বেদপাঠী পরিবার।

বেদ বিদ্যালয় পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ‘‘আমার নাম আকাশ। আমি উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া জেলার বাসিন্দা। বয়স ১০ বছর। দু’বছর বছর আগে যখন আমি এখানে আসি তখন গ্রামের পাঠশালায় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তাম। আমার বাবার ইচ্ছা ছিল আমি ‘বেদ’ নিয়ে পড়াশুনা করি। যখন তিনি আমাকে দিল্লী নিয়ে আসছিলেন তখন জানতাম না কোথায় যাচ্ছি। গ্রামের কথা মনে পড়ছিল। এখানে যখন পৌঁছলাম তখন দেখলাম আমার মতো অনেক ছেলে আগে থেকেই আছে। মন উদাস ছিল, মায়ের কথা মনে পড়ছিল, গ্রামে খেলার সাথির কথা মনে পড়ছিল। কিন্তু বাবার আদেশ ছিল এখানে থেকেই পড়াশুনা করতে হবে। আজ আমার এখানে দু’ বছর পূর্ণ হলো। আমার মন এখানে বসে গিয়েছে। এখানে বাড়ির মতোই স্নেহ-ভালোবাসা।’’ —কথাগুলি ছোট্ট আকাশের।

যে বয়সে ছেলে-মেয়েরা ভিডিও গেম, ইন্টারনেট, ফিল্ম দেখা ও খেলাধুলায় মেতে থাকার কথা সেই বয়সে আকাশ বেদপাঠে মশগুল। কিন্তু বেদ বিদ্যালয়ের এক ছোট্ট বালক আকাশ যখন গর্বভরে বলছে তার লক্ষ্য সারাদেশে বেদ প্রচার করা তা কম কথা নয়। তার কথায়— যখন এখানে এসেছিল তার মনেই হয়নি যে পরিবারের বাইরে আছে। এখানে মায়ের ভালবাসা, বাবার স্নেহ ও সহপাঠীর সখ্য, — একেবারে বাড়ির মতো পরিবেশ সে পেয়েছে। এখানে মায়ের মতোই এত ভালোবাসেন শ্রীমতি দেবরানি শর্মা। তাই বাড়ির মায়ের কথা মনেই পড়ে না।

এই অনুপম দৃশ্য দিল্লীর সঙ্গম বিহার এলাকাস্থিত বেদপাঠী পরিবারের। এখানে ‘বেদাচার্য শ্রীরামজীলাল পালিওয়ালের সামবেদ বিদ্যালয়’ মুনিঋষির পরম্পরাকে ধরে রেখেছে। রামজীলাল পালিওয়ালের স্মৃতিতে ২০০২ সালে আচার্য ডঃ কীর্তিকান্ত শর্মা এই বিদ্যালয় পরিবার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি বর্তমানে নয়া দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলাকেন্দ্রের পদাধিকারী। এখানে বেদ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ শিক্ষা এবং সংস্কৃতে কথা বলা শেখানো হয়।

বিদ্যালয় শুরু করার আগে ডঃ শর্মার মনে চিন্তা ছিল যে, বিদ্যার্থীরা কোথায় থাকবে, কি খাবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কীভাবে পাওয়া যাবে ইত্যাদি। কিন্তু মনের জোরে ও গৃহিণীর সহযোগিতায় সবই ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। শ্রী শর্মা বলেন— প্রথমে ছোট্ট একটা বাড়িতে ৮ জন বালককে নিয়ে বিদ্যালয় শুরু হয়। বাড়িতে ৩টি ঘর ও একচিলতে খেলার মাঠ ছিল। সেখানেই ছেলেরা পড়াশুনা ও খেলাধুলা করতে থাকে। আমার কখনোই মনে হয়নি যে এরা আমার সন্তান নয়। ডঃ শর্মা তাঁর ‘বেদবিদ্যালয় পরিবার’ সম্পর্কে বলেন— ‘‘আমার গুরু আমাকে আদেশ দিয়ে বলেছেন— বেদ রক্ষার জন্য তা প্রচার করতে হবে। সবচেয়ে প্রথমে ১৯৮৫ সালে কাঞ্চী কামকোটি পীঠের শঙ্করাচার্য শ্রীজয়েন্দ্র সরস্বতীর কৃপায় নয়া দিল্লীর কামাক্ষ্যা মন্দিরে বেদবিদ্যালয় স্থাপন করি। কিন্তু সেটা বেশিদিন চলেনি। এখন ‘বেদবিদ্যালয় পরিবার’ আমার স্ত্রী’র বিশেষ সহযোগিতায় খুবই ভালোভাবে চলছে। এতবড় পরিবার চালানো তো কম কথা নয়! এই পরিবারের সমস্ত বিদ্যার্থীর সত্যিকারের মা আমার স্ত্রী।’’

বিদ্যালয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ৩০ জন বিদ্যার্থীর এই ‘পরিবার বিদ্যালয়’ চালাতে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা, পোশাক-আশাক ইত্যাদির খরচ শুধুমাত্র আমার বেতনের পয়সায় কুলোয় না। কিন্তু এখন উজ্জয়িনীর ‘মহর্ষি সান্দীপন রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠান’ একজন অধ্যাপকের ১০ হাজার টাকা বেতন ও প্রত্যেক বিদ্যার্থীর জন্য এক হাজার টাকা করে মাসে মাসে দেওয়ায় কোনো রকমে বিদ্যালয় চলছে। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, এখন বাবা-মা’র ভারতীয় পরম্পরার প্রতি অনীহা দেখানোয় বিদ্যার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু পরক্ষণেই গর্বভরে জানালেন, এখানে পড়াশুনা করা ছাত্ররা আজ কানপুর, প্রয়াগ, বারাণসী, গাজিয়াবাদ, উজ্জয়িনী ও বতৌর-এর মতো সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছে। কিছু ছাত্র পি এইচ ডি করছে। এখানে পড়াশুনা করা ছাত্র জ্যোতিষ, পাণ্ডুলিপি ও বেদের ওপর গবেষণা করছে।

শর্মাজীর স্ত্রী বললেন— যখন কোনো ছাত্র পড়াশুনা শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে যায় তখন মন খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এত দুঃখ নিজের সন্তানের জন্যও হয় না। সারারাত ঘুম আসে না, খাওয়া-দাওয়া কিছুই ভাল লাগে না। মনকে সান্ত্বনা দিই এই ভেবে যে তারা তো বেদ প্রচার করতেই যাচ্ছে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার ক(নে মাত্র দুই মিনিটে (ৈর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল -৯৪৩৪৩২৬০৬২

"স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের জনগণ জগতে শ্রদ্ধার আসন লাভ করার এক সুযোগ পেয়েছে। কারণ জগৎ তাকেই শ্রদ্ধা করে যে বুঝিয়ে দেয়, শান্তিপূর্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং ঐক্যবদ্ধ কাজ — সকলের ত্রাস উৎপাদন করে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

লুপ্ত সরস্বতীর উৎস সন্ধানে

নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রয়াগের সরস্বতী হিন্দু মানসের সঙ্গে যুক্ত এক বিখ্যাত নদী। বন্দরপুচ্ছ পর্বতশৃঙ্গে যার উৎপত্তি, হরিয়ানার আদি বদরিতে যার হিমালয় থেকে উত্তরণ, বিভিন্ন সময়ে নানা পথে প্রবাহিত হয়ে একদা যে নদীটি আরব সাগরে পতিত হয়েছিল। সরস্বতী নদী, তার দেবীত্বে উত্তরণ, তার লুপ্ত হবার ইতিহাস, তার তীরবর্তী সভ্যতার বিকাশ এবং তার প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়গুলির বিস্তার বিশাল। কিন্তু এটি এমন একটি বিষয় যা সকলেরই অল্পবিস্তর জানা প্রয়োজন। কেন লুপ্ত হয়ে গেল সরস্বতী, কেন রাজস্থানের থর মরুভূমি জেগে উঠল, কেমন করে একটু একটু করে নদীটা সরে গিয়েছিল পাকিস্তানের দিকে, ঠিক কোন সময় থেকে লুপ্ত হতে থাকল নদীটা, তার শুকনো খাতগুলি এখন কোথায় রয়েছে— এসব সকলেরই জানা দরকার। আমাদের পূর্বপুরুষদের সহস্র সহস্র বছর ধরে নদীটি তার বুকের মাঝে মায়ের মতো সংগোপনে লালন পালন করে বিদায় নিয়েছে। ঋগ্‌বেদে সরস্বতী সম্পর্কিত নানা বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদেও সরস্বতী সম্বন্ধে অনেক মন্ত্র ও শ্লোক রয়েছে। মহাভারতের বনপর্বে পাণ্ডবরা উত্তরভারত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সরস্বতী তীরের যতগুলি তীর্থ রয়েছে সবকটির উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে সরস্বতী কোথায় কোথায় লুকিয়ে পড়ছেন আর কোথায় কোথায় উঠে আসছেন তার কথা পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সরস্বতীর সাগরসঙ্গম (কচ্ছ) ও সিন্ধুর সাগরসঙ্গম (আরব সাগর) যে আলাদা ছিল তা বলা হয়েছে। অনেকে যদিও বলেন যে সরস্বতী নদী সিন্ধুতে গিয়ে বিলয় হয়েছিল। এখানে তার বিপরীত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। পরে আমেরিকার স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি থেকে এসব তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে বিনশনে তিনি অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছেন। বস্তুত এই সময় থেকেই তিনি লুপ্ত হতে চলেছেন। সময়কালটা মনে রাখার মতো ১৪১৬ খৃস্ট-পূর্বাব্দ। মহাভারতে সরস্বতী নদীর উল্লেখ বারবার হয়েছে। শল্যপর্বে উল্লেখিত সরস্বতীর সাতটি নাম ও সেই নদীগুলির স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে তথ্য

রয়েছে। ব্রহ্মা পুষ্করে যজ্ঞ করার সময় সরস্বতীকে আহ্বান করলেন এবং নাম দিলেন সুপ্রভা। তা হলে সরস্বতী পুষ্করেও ছিল। এখনকার নৈমিষারণ্য গোমতী নদীর তীরে লক্ষ্ণৌ-এর কাছে আর মহাভারতের নৈমিষারণ্য হরিয়ানায়, অধুনা লুপ্ততীর্থ। হরিয়ানার মধ্য দিয়ে সরস্বতী প্রবাহিত হোত সেটিও প্রমাণিত হয়েছে। সরস্বতীর বাস্তবিক গতিপথ কোথায় ছিল এবং কেমন ছিল?

ভূমির উৎক্ষেপণের ফলে সরস্বতী নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছিল। সরস্বতী নদী পূর্বদিক থেকে কয়েক সহস্র বছরে পশ্চিম দিকে সরে গিয়েছিল সেকথা এখন প্রমাণিত। সরস্বতীর লুপ্ত নদীখাত গুলি আবিষ্কারের প্রথম প্রচেষ্টা করেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যশপাল। ১৯৮০ সালে তিনি আমেরিকান ল্যান্ডস্যাট উপগ্রহ দিয়ে তোলা কিছু ছবি ইউরোপ থেকে পান। সেগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখতে পান ভারতের ওপর এমন কিছু দাগ যা তিনি সরস্বতীর নদীখাত বলে সন্দেহ করেন। ১৯৮৫ সালে ভীমবেটকা গুহার আবিষ্কারক ডঃ ভিকেওয়াকালেকর ভারত সরকারের সহায়তায় একটি বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে মহাভারতে বর্ণিত বলরামের যাত্রাপথে পরিক্রমা করেন। সরস্বতীর সর্বশেষ রাস্তাটি জানা হয়ে যাবার পর ভারত সরকার সরস্বতী গবেষণার দিকে নজর দেন। মণিরত্ন মুখোপাধ্যায় এই গবেষণা কার্যেরই একজন সৈনিক। লেখক দু’ দশক ধরে সরস্বতীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পায়ে হেঁটেছেন ভারত সরকারের নানা অন্বেষক দলগুলির সঙ্গে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথায় কী গবেষণা হয়েছে, কোথায় খনন কার্য চলছে সব দেখেছেন। তাঁর এই গবেষণার ফসল ‘লুপ্ত সরস্বতী’। এবং এ প্রসঙ্গে এটাই প্রথম বাংলা বই। বইটির নির্ভুল ছাপা ও ছবি এবং স্কেচ আকর্ষণীয়। বইটি আমাদের সকলেরই পড়া উচিত।

লুপ্ত সরস্বতী। লেখক : মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : সিগনেট প্রেস। আনন্দ পাবলিশার্স। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা-৯। দাম : ২০০ টাকা।

তিনটি ব্রিগেড-সভার রোজনামচা

ব্রিগেডে তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের হয়ে গেল সমাবেশ। ৩০ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস, ৫ ফেব্রুয়ারি বিজেপি ও ৯ ফেব্রুয়ারি বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের জনসভা, যা ২০১৪ সালের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের নির্বাচনী জনসভার সূচনামাত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বরং বলা ভালো, তিনটি জনসভা থেকে বাজানো হলো নির্বাচনী দামামা। তবে জনসমাবেশের দিক থেকে নানা মুনির নানা মত থাকলেও প্রতিটি জনসভাতেই যে লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল তা বলাই বাহুল্য।

তবে তিনটি দলই রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি সমর্থকদের কাছে দিয়েছে নিজ নিজ বার্তা। তৃণমূলের মুখ্য বার্তাটি ছিল, কংগ্রেস ও বিজেপি থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে ফেডারেল ফ্রন্ট গঠন করে দিল্লীতে নির্ণায়ক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করা। তবে ব্রিগেডের সভাতেও তিনি খেলেছেন সংখ্যালঘু কার্ড। কারণ তিনি ছাড়া আর একজনই পেয়েছিলেন ব্রিগেডে বক্তব্য রাখার সুযোগ। তিনি হচ্ছেন কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম নুরুর রহমান বরকতি।

নরেন্দ্র মোদী ব্রিগেডে এসেছেন ২৭২+ মিশন নিয়ে। তিনি মমতা সরকারের কড়া সমালোচনা করেননি ঠিকই কিন্তু প্রশংসায় ভরিয়েও দেননি। তিনি জানেন, এ রাজ্যের ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটের মায়াবী চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না মমতা, তবুও এ রাজ্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি। কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত নয়, বরং সহমতই কাম্য। তাই তিনি এ রাজ্য সরকারকে সময় দিতে চেয়েছেন, কিন্তু রাজ্যবাসীর কাছে তিনি ৪২টি সিটই চেয়েছেন তাঁর দিল্লী যাত্রার পথ সুগম করতে। আবার তিনি দিল্লী পেলে এ রাজ্যের অনুন্নয়নের মরা গাঙে উন্নয়নের জোয়ার আনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এটা তাঁর ঔদার্যেরই বহিঃপ্রকাশ। তবে একথাও সত্যি, এসবই 'কাকস্য পরিবেদনা'।

অবশ্য বামেরা ব্রিগেডে বড় সমাবেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের ভোট প্রায় অটুট। আবার শাসকদলের অনেক হুমকি, ধমকি, ভীতি প্রদর্শন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি সত্ত্বেও ব্রিগেডে মোদীর সভায় যারা এসেছে তারা কট্টর মোদী-অনুরাগী। আর মমতার সভায় যারা ব্রিগেডে এসেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক ভেজাল। কারণ বহু তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বলতে শোনা যাচ্ছে, রাজ্যে তারা তৃণমূল, কিন্তু দিল্লীতে চায় মোদীকে।

চিঠিপত্র

তাছাড়া যাদের জোরজবরদস্তি ব্রিগেডে এনেছে তৃণমূলীরা তারাও ভোট দেবে না তৃণমূলকে। আবার প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ফ্যাক্টর, ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ, খুনোখুনি, তোলাবাজি, দুর্নীতি, ভোট ডাকাতি, বেকারি এবং নির্লজ্জ মুসলিম তোষণে বিরক্ত অসংখ্য হিন্দু ও বহু তৃণমূল সমর্থকও যে তৃণমূল ছেড়ে মোদী-ক্যাম্পে ভিড়বেন তা বলাই বাহুল্য। তার পরেও 'মিডিয়া' যেভাবে প্রচার করে চলেছে যে এ রাজ্যে মোদী হাওয়ার চোরাস্রোত বইছে এবং 'জনমত' সমীক্ষাও এ রাজ্যেও পদ্মফুল ফোটার ইঙ্গিত দিচ্ছে, তাতে মমতার পি এম হওয়ার 'স্বপ্ন' স্বপ্নই থেকে যাবে।

ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের অস্তিত্ব

গত ১০ ফেব্রুয়ারি স্বস্তিকা পত্রিকায় মাননীয় গোপীনাথ দে মহাশয়ের 'ভারতের বর্তমান অবস্থা' শিরোনাম শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে আনন্দিত হলাম। আর তারই প্রেক্ষিতে আমার এই লেখা। এ থেকে মনে একটাই প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি আমরা যারা দেশকে একটু ভালবাসি ও দেশের মঙ্গল কামনা করি— তাদের হিন্দুত্বের অস্তিত্ব রক্ষা করার সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় এসেছে। বর্তমান ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে শাসকশ্রেণীর ক্রমাগত কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতি তোষণের ফলে আজ হিন্দু জাতির প্রতি চরম অবহেলা, স্বদেশেও প্রতিবেশী দেশগুলি হতে হিন্দুদের প্রতি দুর্বিসহ অত্যাচার, তাদেরকে সে দেশ হতে চলে আসতে বাধ্য করছে। এটা কি সত্যিই আমাদের মনে পীড়া দিচ্ছে না?

আমার মনে হয়, হিন্দুজাতির প্রতি এই চরম বৈষম্য নিরসনের জন্য হিন্দুদের এখনই সজাগ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। উক্ত প্রতিবেদনটিতে তিনি স্বাধীনতার জন্মলগ্ন অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যার নিরিখে মুসলিম জনসংখ্যার হার দিয়েছেন তা ছিল ১৭ শতাংশ মুসলিম আর বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ২৯ শতাংশ। অতএব খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে যখনই তা ৫০ শতাংশে কিংবা তারও বেশিতে দাঁড়াবে স্বাভাবিকভাবেই দেশ ভাগের প্রশ্ন দেখা দেবে। তখন এদেশে হিন্দুদের অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে সে কথা হিন্দু ভাইয়েরা একবার ভেবে দেখবেন কি? শুধু তাই নয়, আজ যেমন কাশ্মীরে ঘটছে— কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিতাড়িত হয়ে অন্যত্র গিয়ে নিজ দেশে পরবাসীর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ কিনা জনসংখ্যার ভিত্তিতে তারা দেশকে বিগত ১৯৪৭ সালের ন্যায় বিভাজনের প্রশ্ন তুলবে। যতই হিন্দুদের তুলনায় বেশি সুযোগ লাভ করুক না কেন তাদের কেউ যে এদেশকে এতটুকু ভালবাসে না সেকথা নিসন্দেহে বলা যায়।

সুতরাং হিন্দু ভায়েদের এখনই চিন্তা করা প্রয়োজন যে আগামীদিনে দেশে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে তাদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত।

পাঁচুগোপাল ঘোষ,
নরেন্দ্রপুর, হাওড়া।

পদ্মফুলে ভোট

স্বস্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোড়শ লোকসভার নির্বাচন আসন্ন। আড়াই বছর আগে আমরা ৩৪ বছরের কম্যুনিস্ট অপশাসন থেকে পশ্চিমবাংলাকে মুক্ত করেছি। বর্তমান তৃণমূলী শাসনের ভালমন্দ বিচার আমরা আরও আড়াই বছর বাদে করব।

বাংলায় যেমন আমরা ভোটদাতারা রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছি তেমনি দেশবাসী আজ কেন্দ্রেও কংগ্রেসী (ইউপিএ) অপশাসন থেকে মুক্তি চাইছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কেন্দ্রে যত সরকার হয়েছে তার মধ্যে গত দশ বছরের মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর অঙ্গুলি হেলনে যে কংগ্রেসী সরকার চলছে তা সর্বকালীন নিকৃষ্টতম। সবদিক দিয়ে এমন অপদার্থ সরকার এর আগে আমরা কখনও দেখিনি। লাগাম ছাড়া ভ্রষ্টাচার, ইসলামিক, খৃস্টীয় এবং মাওবাদী সন্ত্রাসবাদের আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে ভারত। আইন- শৃঙ্খলা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। নারী নির্যাতন অবাধ। সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। আজ ঘরে ঘরে বেকার যুবক-যুবতী। কৃষি বা শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোনো প্রয়াস বিগত দশ বছরে হয়নি। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁওয়া। অবাধ অনুপ্রবেশ ও সীমান্ত সমস্যায় জর্জরিত দেশ। দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী ও আমলাদের অবাধ আর্থিক লুঠ ও স্বজন পোষণ চলছে। বিশ্বের সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ। অথচ আন্তর্জাতিক বিশ্বে ভারতের মান-মর্যাদা আজ ভূলুণ্ঠিত।

দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি (এনডিএ)-র ৬ বছরের শাসন আমরা দেখেছি। সেই সময় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ছিল। টেলিফোন, মোবাইল, কমপিউটার, রান্নার গ্যাস ইত্যাদি ভোগ্যপণ্য থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে দেশবাসীর কাছে সহজলভ্য করে দিয়েছিল বিজেপি সরকার। আমেরিকার দাদাগিরিকে উপেক্ষা করে বাজপেয়ীজী পোখরানে অ্যাটমবোমা এবং হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই সময় আমেরিকা-সহ বিশ্বের আর্থিক সম্পন্ন দেশগুলি (জি-৮) ভারতের সঙ্গে আর্থিক, বাণিজ্যিক অসহযোগিতা ঘোষণা করেছিল। বাজপেয়ীজীর সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সেই সঙ্কট মোচন করেছে। কোনো দেশের কাছে মাথা নত করেনি। ওই দেশগুলি নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে একে একে ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়াবার জন্য বাজপেয়ীজী লাহোর যাত্রা করেছিলেন। সেই সময় পাকিস্তানের সেনারা জম্মু-কাশ্মীরের কার্গিল অঞ্চলের অনেক পাহাড় দখল করে নেয়। বাজপেয়ীজীর নির্দেশে ভারতীয় জওয়ানরা অমিত বিক্রমে পাকিস্তানী সেনাদের বিতাড়িত করে কার্গিলকে মুক্ত করে। বাজপেয়ীজীর পূর্ববর্তী নরসিংহ রাওয়ের কংগ্রেসী সরকার বৈদেশিক ঋণের পাহাড় তৈরি করেছিল। ফলে আন্তর্জাতিক চাপে ভারত সরকার ৬৪ টন সোনা ইংল্যান্ডে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিল। ৬-বছরের বিজেপি সরকার লক্ষ-লক্ষ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ শোধ করে সব সোনা ফেরত এনেছিল। তাছাড়া সর্বকালীন বৃহৎ বৈদেশিক অর্থভাণ্ডার মজুত রেখে গেছিল।

কেন্দ্রে নির্বাচনের দামামা বাজলেই সিপিএমের নেতৃত্বে দেশের পরস্পরবিরোধী আঞ্চলিক দলগুলি নিয়ে তৃতীয় ফ্রন্টের কথা ওঠে। এবার তৃণমূলনেত্রী মমতাদিদির নেতৃত্বে ফেডারেল ফ্রন্টের কথা শোনা যাচ্ছে। তবে এযাবৎ আন্না হাজারে ছাড়া তিনি বিশেষ দোসর পাননি। এই তৃতীয় ফ্রন্ট বা ফেডারেল ফ্রন্ট আসলে 'সোনার পাথর বাটি' বা 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব'-গোছের অবাস্তব কল্পনা। মুলায়ম, মায়াবতী, জয়ললিতা, নীতিশ কুমার, দেবেগৌড়া, মমতাদিদি সকলেই তো প্রধানমন্ত্রী হতে চান। আমরা সচেতন ভোটাররা সকলেই জানি যে কংগ্রেসী অপশাসনের বিকল্প একমাত্র বিজেপি। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর নাম বিজেপি ঘোষণা করেছে। নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারি মুক্ত আজ গুজরাট। সফল প্রশাসক হিসাবে দেশে এবং সারা বিশ্বে নরেন্দ্র মোদীর নাম ছড়িয়ে গেছে। সংকল্পে দৃঢ়, আগাগোড়া সৎ, সরল, অনাড়ম্বর, অকপট নরেন্দ্র মোদীকে যদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমরা দেখতে চাই তাহলে আমাদেরও কিছু ইতি কর্তব্য আছে। পশ্চিমবাংলা থেকে এক ঝাঁক বিজেপি প্রার্থীদের সাংসদ হিসাবে বিজয়ী করে দিল্লী পাঠাতে হবে। বিজেপি সর্বত্র যোগ্যতম প্রার্থীদের দাঁড় করাবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আসুন, আমরা সকলে মিলে নরেন্দ্র মোদীকে সন্ত্রাস মুক্ত, বেকারি-দ্রারিদ্র-দুর্নীতিমুক্ত, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য যুক্ত, মাতৃজাতির সার্বিক নিরাপত্তা যুক্ত সমৃদ্ধ বৈভবসম্পন্ন ভারত নির্মাণে সহযোগিতা করি। আসুন, আমরা নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিজেপি প্রার্থীদের বিজয়ী করি।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে প্রদর্শনীতে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র নির্মাল্য মণ্ডল

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ৫৫তম বার্ষিক প্রদর্শনী

দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের উদ্যোগে গত ১১-১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে পশ্চিমবাংলার নদ-নদী, ভেষজ উদ্ভিদ, ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক, মহামানব গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি প্রদর্শনী উপস্থাপনা করেছে। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে এই প্রদর্শনী হয়ে আসছে। 'পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী' প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের বুকে বয়ে যাওয়া নদীগুলির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গঙ্গাদূষণ ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি অস্তিত্বহীন নদীর নানারকম বৈশিষ্ট্য জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ভেষজ উদ্ভিদ, যেমন— আমলকি, তুলসী প্রভৃতি গাছের প্রদর্শনী স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছে। 'ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক' প্রদর্শনীতে অধিকাংশ ছাত্রই অংশগ্রহণ করেছিল যেখানে বিজ্ঞানের চেতনা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা নেওয়া হয়েছে। মহামানব গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর সময়ে নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও তাঁর জীবনকাল নিয়ে আরও একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া চাঁদের পাহাড় (সাহিত্য), ভূগোল, পুরাণ, দেওয়াল পত্রিকা, নাটক প্রভৃতি প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়েছিল জনচেতনা জাগ্রত করার জন্য ও শিক্ষার বিকাশ ঘটাবার জন্য। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র নির্মাল্য মণ্ডল, মৃগাঙ্গ বিশ্বাস, ঐকিক মাঝি, ঋতব্রত সিনহা, অগ্নীশ্বর দাস, সৌভিক দাস, অর্পণ দাস, সন্দীপ দাস ও আকাশচারির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সংস্কার ভারতীর পূর্বক্ষেত্র বৈঠক

গত ১ ও ২ মার্চ দু'দিন ব্যাপী সংস্কার ভারতীর পূর্বক্ষেত্র বৈঠক সম্পন্ন হলো ওড়িশার খুর্দা রোড নিকটস্থ জটনী সরস্বতী শিশু মন্দিরে।

সংস্কৃতি জগতের শিল্পীদের বিকাশ ও সুস্থ, সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মাণের জন্য নিয়মিতভাবে প্রান্তীয়স্তরে শিল্পী সম্মেলন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রমুখ বৈঠক ও কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক গণেশ ত্র্যম্বক রোড়ে এবং সঞ্চালনা করেন সহ-সংগঠন সম্পাদক আমীর চাঁদ।

দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, ওড়িশা, উত্তর বিহার, দক্ষিণ বিহার ও ঝাড়খণ্ড প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ থেকে অধীর রায়, বিকাশ কুমার ভৌমিক ও বিপ্লব কুমার দেব এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে প্রান্তীয় সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু প্রতিনিধিত্ব করেন।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ আলানাথ ঘোষ তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা কাবেরীর শুভবিবাহ উপলক্ষে দক্ষিণবঙ্গ- প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তপ্রচারক রমাপদ পাল বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া বিভাগ সঙ্ঘচালক দুর্গাদাস রায়চৌধুরী ও জেলা সঙ্ঘচালক সমর রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সহ-শারীরিক প্রমুখ পঙ্কজ মণ্ডল।

শোকসংবাদ

নদীয়া জেলার কল্যাণী (এ-৮/২১৮) নিবাসী প্রবীণ স্বয়ংসেবক রণজিৎ কুমার বিশ্বাস গত ২৭ জানুয়ারি, সোমবার পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। তাঁর জন্ম পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) যশোর জেলার মাস্তরার পাননদিয়াল গ্রামে। তাঁর সঙ্ঘায়ু ৫০ বছর। সঙ্ঘ-অন্তপ্রাণ রণজিৎ কুমার বিশ্বাস সঙ্ঘের অনুশাসন আমৃত্যু পালন করে গেছেন। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা, পুত্রবধূ, নাতি, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক।

ক্রীড়াভারতীর কবাডিতে সেরা ক্যালকাটা অলরাউন্ডার

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বভারতীয় বেসরকারি ক্রীড়াসংগঠন ক্রীড়াভারতীর দক্ষিণবঙ্গ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত কলকাতা মহানগর শাখার উদ্যোগে হয়ে গেল একদিনের কবাডি টুর্নামেন্ট। এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে এই সংগঠনের প্রতি কবাডি অনুরাগীদের প্রবল উৎসাহের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি উত্তর কলকাতার কবাডির আঁতুড়ঘর বলে স্বীকৃত রবীন্দ্রকাননে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে স্কুল ও ক্লাব তথা সঙ্ঘ মিলিয়ে ১৭টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। উল্লেখযোগ্য টিমগুলি ছিল ক্যালকাটা অলরাউন্ডার, জ্ঞানভারতী স্কুল, বিজয় সংঘ, রামকৃষ্ণ সংঘ, শ্যামপুকুর সংঘ, শৈলেন্দ্র সরকার স্কুল, গোপেশ্বর দত্ত ফ্রি স্কুল, পার্ক ইনস্টিটিউশন, ক্যালকাটা জুবিলি স্কুল প্রভৃতি। শেষ পর্যন্ত ফাইনালে ক্যালকাটা অলরাউন্ডার জ্ঞানভারতী স্কুলকে হারিয়ে চাম্পিয়ন হয়েছে। এরা ছাড়া সেমিফাইনালে ওঠা বাকি দু'টি টিম যথাক্রমে ক্যালকাটা জুবিলি ও গোপেশ্বর দত্ত ফ্রি স্কুল।

নারকেল ফাটিয়ে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন অতীতের প্রখ্যাত তারকা তথা ভারত অধিনায়ক বিশ্বজিৎ পালিত ও ক্রীড়াভারতীর প্রাদেশিক প্রধান সংগঠক মধুময় নাথ। রবীন্দ্রকাননে কবাডি অনুশীলন ও খেলা চালানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন বাজার অশোক সংঘ ও রাজ্য কবাডি সংস্থা যৌথভাবে ক্রীড়াভারতীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে এই টুর্নামেন্টটি সফলভাবে সংগঠন করতে। সমস্ত ম্যাচ পরিচালনা 'ডেস্ক জব' বা অফিসিয়াল ফর্মালিটি সমস্ত কিছুর দায়িত্ব যথেষ্ট নিষ্ঠা ও গুরুত্ব সহকারে পালন করেছেন তাঁরা। যেহেতু এই অঞ্চলে কবাডি প্রভূত জনপ্রিয় তাই স্থানীয় জনমানসে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল ক্রীড়াভারতীর টুর্নামেন্ট ঘিরে। এই টুর্নামেন্টের মাঝপর্বে মাঠে এসেছিলেন রাজ্য অলিম্পিক সংস্থার ভূতপূর্ব সচিব তথা বর্তমান রাজ্য খো খো কর্তা কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন কবাডি খেলোয়াড় ভবানীপ্রসাদ পাত্র, ভারতীয় মহিলা যুব দলের কোচ বর্ণালী সাহা, রাজ্য কবাডি সংস্থার আহ্বায়ক রাধেশ্যাম আগরওয়াল-সহ ক্রীড়াভারতীর সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন অলিম্পিয়ান রাইফেল শ্যুটার ভগীরথ সামুই।

ফাইনালে বিজয়ী ও বিজিত দলকে পুরস্কার তুলে দেন বিশ্বজিৎ পালিত, ভগীরথ সামুই। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে স্মারক ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অর্জুন তথা এশিয়াডে সোনাজয়ী জাতীয় দলের অধিনায়ক বিশ্বজিৎ পালিত তাঁর ভাষণে বলেন, শুধুমাত্র বিভিন্ন খেলার রাজ্য সংগঠন ও বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যে ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে যথেষ্ট নয়। দরকার বিভিন্ন বেসরকারি ক্রীড়া সংগঠনের সক্রিয় উদ্যোগ ও কার্যকরী ভূমিকা। ক্রীড়াভারতী এমনই এক সংগঠন— যার দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ, উদ্দেশ্য মহৎ, সামাজিক ক্রীড়াবাতায়ন সংস্কারে দায়বদ্ধ। একই কথা বলেছেন ভগীরথ সামুই, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়-সহ মঞ্চ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অভ্যাগত। বিশেষ করে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী সব টিমের খেলোয়াড় ও কোচ ক্রীড়াভারতীর এই উদ্যোগের সঙ্গে যেভাবে মানসিক ও আত্মিকভাবে মিশে গিয়েছিলেন, তা দেখে মনে আশা জাগে যে এখনো সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি।

বিশ্বজিৎ পালিত ক্রীড়াভারতীর সংগঠকদের আশ্বাস দিয়ে বলেন এই টুর্নামেন্ট থেকে যেসব ভাল খেলোয়াড়ের সন্ধান মিলবে তাদের অশোক সংঘ-সহ কলকাতার অন্যান্য বড় দলে অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়া হবে। আর সংগঠনের প্রমুখ মধুময় নাথের কথায় জানা গেল, ক্রীড়াভারতী দেশের যেসব ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রামীণ ক্রীড়া আছে তার পুনর্জীবনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি খেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোকবল, অর্থবল, সুযোগ-সুবিধে সব কিছু আছে। কিন্তু কবাডি, খো খো, মালখাম, কলারিপাটায়ু (মার্শাল আর্টের আদি সংস্করণ) সহ অন্যান্য পরম্পরাগত দেশজ খেলাকে জাতীয় ক্রীড়া সংস্কৃতির মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য ক্রীড়াভারতী অঙ্গীকারবদ্ধ। কবাডি ছাড়া সাম্প্রতিককালে ভারতের চিরন্তন জীবনবেদ যোগাসনকে নিয়ে অনেক কর্মসূচি নিয়েছে ক্রীড়াভারতীর প্রাদেশিক সংগঠন। ধাপে ধাপে সারা বছর ধরে তা বাস্তবায়িত হবে। সমগ্র ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালন করেন বিভাস মজুমদার।

শব্দরূপ-৭০৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

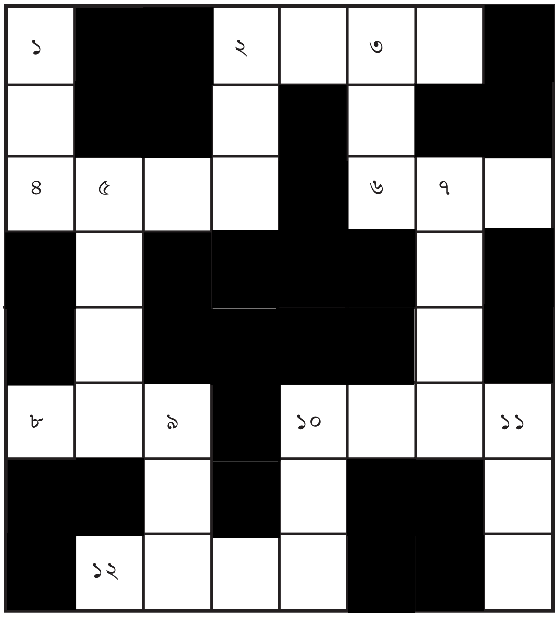

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. মহাবিপদ্‌সূচক দুর্লক্ষণ, ধূমকেতু ভূমিকম্প উল্কাপাত ইত্যাদি। (জ্যোতিষে) অশুভ যোগ বিশেষ, ৪. গণেশ, ৬. শিবের জটা; কড়ি, ৮. ল্যাম্পের উপরের কাঁচের চোঙা, ১০. ছাত্রবৃত্তি; জলখাবার খাইবার পয়সা, ১২. ইন্দ্রপুরী, ইন্দ্রের ধ্বজ।

উপর-নীচ : ১. সর্প, ২. যে বিষয়ে অত্যাসক্তি দূষণীয়, নেশা, ৩. যে পবিত্র করে; অগ্নি, ৫. আরবি প্রতিশব্দে নরক, ৭. চতুর্দিকে অগ্নি ও উপরে সূর্য—এই পঞ্চ উত্তাপের মধ্যে যে তপস্যা করে, ৯. পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড-জলাদি, ১০. ইন্দ্রের পুত্র, ১১. বৈষ্ণবধর্মের সনক সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য।

সমাধান
শব্দরূপ-৭০৩
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
রতন রায়
বর্ধমান

					উ	নু	ই
	ভা	র	বি		দ্ধ		নি
প্র			রা	ঘ	ব		য়ে
জ্ঞা	ন	যো	গ				বি
পা				দা	দ	খা	নি
র		কৃ	ন্ত	ন			য়ে
মি		ত্তি		ব	টু	ক	
তা	ড়	কা					

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭০৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ এপ্রিল, ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বিক্রমাদিত্য।। ২৩

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দলের প্রার্থী তালিকা

কেন্দ্র	বিজেপি	বামফ্রন্ট	তৃণমূল	কংগ্রেস
কোচবিহার	হেমচন্দ্র বর্মণ	দীপক রায়	রেণুকা সিংহ	কেশব রায়
আলিপুরদুয়ার		মনোহর তিরকে	দশরথ তিরকে	যোশেফ মুন্ডা
জলপাইগুড়ি	সত্যলাল সরকার	মহেন্দ্র রায়	বিজয়ভূষণ বর্মন	সুখবিলাস বর্মা
দার্জিলিং		সমন পাঠক	ভাইচুং ভুটিয়া	
রায়গঞ্জ	নিমু ভৌমিক	মহম্মদ সেলিম	সত্যরঞ্জন দাশমুন্সি	দীপা দাশমুন্সি
বালুরঘাট	বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী	বিমল সরকার	অর্পিতা ঘোষ	
মালদহ (উত্তর)	সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী	খগেন মুর্মু	সৌমিত্র রায়	মৌসম বেনজির নূর
মালদহ (দক্ষিণ)		আবুল হাসনাত	মোয়াজ্জেম হোসেন	আবু হাসানাত খানচৌধুরী
জঙ্গিপুর	সম্রাট ঘোষ	মুজফ্ফর হোসেন	হাজি নুরুল ইসলাম	অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
বহরমপুর	সুশান্তরঞ্জন পাল	প্রমথেশ মুখোপাধ্যায়	ইন্দ্রনীল সেন	অধীর চৌধুরী
মুর্শিদাবাদ	সুজিতকুমার ঘোষ	বদরুদ্দোজা খান	মহম্মদ আলি	মান্নান হোসেন
রানাঘাট	সুপ্রভাত বিশ্বাস	অর্চনা বিশ্বাস	সৌগত বর্মন	প্রতাপ রায়
কৃষ্ণনগর	সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়	শান্তনু ঝা	তাপস পাল	
বনগাঁ	কে ডি বিশ্বাস	দেবেশ দাস	কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর	
ব্যারাকপুর	আর কে হান্ডা	সুভাষিণী আলি	দীনেশ ত্রিবেদী	
দমদম	তপন শিকদার	অসীম দাশগুপ্ত	সৌগত রায়	
বারাসত	পি সি সরকার (জুনিয়র)	মোর্তাজা হোসেন	কাকলি ঘোষদস্তিদার	ঋজু ঘোষাল
বসিরহাট	শমীক ভট্টাচার্য	নুরুল হুদা	ইদ্রিশ আলি	
জয়নগর		সুভাষ নস্কর	প্রতিমা নস্কর	অর্ণব রায়
মথুরাপুর	তপন নস্কর	রিঙ্কু নস্কর	সি এম জাটুয়া	
ডায়মণ্ড হারবার	অভিজিৎ দাস	আবুল হাসনাত	অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়	মহম্মদ কামারুজ্জমান
যাদবপুর		সুজন চক্রবর্তী	সুগত বসু	
কলকাতা (উত্তর)	রাহুল সিংহ	রূপা বাগচি	সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	সোমেন মিত্র
কলকাতা (দক্ষিণ)	তথাগত রায়	নন্দিনী মুখোপাধ্যায়	সুব্রত বক্সী	
উলুবেড়িয়া	আর কে মহান্তি	সবিরুদ্দিন মোল্লা	সুলতান আহমেদ	অসিত মিত্র
হাওড়া	জর্জ বেকার	শ্রীদীপ ভট্টাচার্য	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	
শ্রীরামপুর		তীর্থঙ্কর রায়	কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
হুগলি	চন্দন মিত্র	প্রদীপ সাহা	রত্না নাগ	
আরামবাগ	মধুসূদন বাগ	শক্তিমোহন মালিক	আফরীন আলি	
তমলুক	বাদশা আলম	শেখ ইব্রাহিম আলি	শুভেন্দু অধিকারী	
কাঁথি		তাপস সিংহ	শিশির অধিকারী	
ঘাটাল	মহম্মদ আলম	সন্তোষ রাণা	দীপক অধিকারী (দেব)	
ঝাড়গ্রাম	বিকাশ মুদি	পুলিনবিহারী বাস্কে	উমা সোরেন	
মেদিনীপুর	প্রভাকর তিওয়ারি	প্রবোধ পণ্ডা	সন্ধ্যা রায়	
পুরুলিয়া		নরহরি মাহাতো	মৃগাঙ্ক মাহাতো	নেপাল মাহাতো
বাঁকুড়া	ডাঃ সুভাষ সরকার	বাসুদেব আচার্য	মুনমুন সেন	
বিষ্ণুপুর	ডাঃ জয়ন্ত মণ্ডল	সুস্মিতা বাউড়ি	সৌমিত্র খান	
বর্ধমান পূর্ব	সন্তোষ রায়	ঈশ্বরচন্দ্র দাস	সুনীল মণ্ডল	
বর্ধমান-দুর্গাপুর	দেবশ্রী চৌধুরী	শেখ সহিদুল হক	মমতাজ সঙ্ঘমিত্রা	
আসানসোল	বাবুল সুপ্রিয়	বংশগোপাল চৌধুরী	দোলা সেন	
বোলপুর	কামিনীমোহন সরকার	রামচন্দ্র ডোম	অনুপম হাজরা	
বীরভূম	জয় বন্দ্যোপাধ্যায়	কামরে ইলাহি	শতাব্দী রায়	সৈয়দ সিরাজ

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
17 March - 2014